দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

জীবনী আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

তোড়াবোড়া হতে এবেটোবাদ..... ৪

সালাহুদ্দীন আল আইয়ুবির জেরুজালেম বিজয় ২১

LIFE OF BIN LADEN (may Allah accept him) last part ২৪

এই হল একজন আফগান মায়ের ঈমান! ২৯

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর সংক্ষিপ্ত জিবনী..... ৩২

LIFE OF BIN LADEN (may Allah accept him) part ১-৭.....৪১

পর্ব ১-৭ এর বাকি অংশঃ..... ৬৬

সাহাবায়ে কেরামের ওয়ালা-বারার কিছু বিস্ময়কর চিত্র ৭২

কিংবদন্তি মুজাহিদ শাইখ জালালুদ্দিন হক্কানি (রহঃ) এর জীবনি.....৭৫

ড.আফিয়া সিদ্দিকি..... ৮২

আবু আহমাদ

Senior Member

০২-১০-২০১৮

তোরাবোরা থেকে আবোটাবাদ

মূল

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কোন এক সন্তান

মূল সম্পাদনা

মুস্তফা হামিদ আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ উমর মুখতার

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে আমার একটু আগ্রহ বেশি। জঙ্গিবাদ নিয়ে আমি আলহামদু লিল্লাহ প্রচুর পড়াশোনা করেছি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি যুদ্ধবিগ্রহের নেপথ্য কারণ। কেউ কেউ হয়তো অনেক বিষয়ে আপত্তি করবেন, তবে আমি মনে করি জানাশোনার অধিকার সবার আছে। বিশেষত এক্ষেত্রে আমি পাকিস্তানের সাংবাদিক সাইয়েদ সালিম শেহযাদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তিনি জঙ্গিবাদ বিশেষ করে আল কায়েদা সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন, যার কারণে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাঁকে গুপ্তহত্যা করেন।

আমার একজন নিকটতম বন্ধু মাদরাসায় পড়েছেন। টুকটাক লেখালেখিও করেন। উনি জানেন যে আমি এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছি, তাই "মিন তোরাবোরা ইলা আবুতাবাদ" নামক একটি দুর্লভ পুস্তিকার অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছেন। বইটি আমি আগাগোড়া দেখেছি, বেশ কিছু জায়গাতে ভাষাগত সম্পাদনা করে দিয়েছি। আমি আসলে একটু উদারবাদী মানুষ। আমি মনে করি পৃথিবীর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে মানুষ জানার অধিকার রাখে। তাই বইটি প্রকাশে কোন প্রকাশককে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছিলাম। যাই হোক পরিশেষে অনুবাদকের ইচ্ছা ও আগ্রহে সিদ্ধান্ত নিলাম ধারাবাহিকভাবে অনুবাদটি গ্রুপে পোস্ট করবো। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই- আমার ব্যক্তিগত অধ্যায়ন হিসেবে বইটির মূল বর্ণনাকারী হিসেবে উসামা বিন লাদেনের ছেলে হামজা বিন লাদেনকে মনে হয়েছে, যদিও মিসরীয় সম্পাদক মুস্তাফা হামেদ আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী কারো নাম উল্লেখ করেন নি।

এবং বইটির ভাষায় বর্ণনাকারীর মূলভাব ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন সন্তান যেভাবে তাঁর বাবাকে সম্ভধোন করে থাকেন, এখানেও তেমনই পাবেন। যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, বাকিটা সম্মানিত পাঠকের উপর বিচারের ভার থাকলো। ইতিহাসের একটি সম্পদ হিসেবে এই ছোট্ট পুস্তিকাটি সংরক্ষিত থাকুক, আল্লাহ তাআলার কাছে এমনটাই দুয়া করি।

মিসরীয় সম্পাদকের ভুমিকা:

এই ঘটনাগুলো এমন একজন লিখেছেন, যিনি ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট, এমন কেউ লেখেননি, যিনি কারো থেকে তা শ্রবণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন শাইখ ওসামা বিন লাদেনের রহঃ এক সন্তান। যারা আফগানিস্তানের ভেতর শাইখের সর্বশেষ সফরে তার সঙ্গে ছিলেন। যা ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে নিয়ে ২০০২ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এবং এই পুরো সফরই সম্পন্ন হয়েছিল ওপর থেকে মার্কিন বিমান বাহিনীর তীব্র গোলা বর্ষণ ও নীচ থেকে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের মধ্য দিয়ে। প্রথমে আফগানিস্তানের কোনাড় প্রদেশে পৌছার নিয়তে কাবুল থেকে তোরাবোরা পর্বত পর্যন্ত, অতঃপর পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল এবং পরিশেষে পেশোয়ার শহর। আমি যখন আমার পক্ষ থেকে মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এবং কথার প্রসঙ্গে

কিছু বলতে চেয়েছি, তখন তা বৃহৎ বন্ধনীর মাঝে লেখে দিয়েছি। সেখানে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী সে যুদ্ধের ঘটনাবলীর ডায়েরী নিরীক্ষণ করে ঘটনাগুলোর তারিখ যুক্ত করে দিয়েছি।

এছাড়া বাকি সকল লেখা সেই বর্ণনাকারীর, যিনি তাঁর বাবা উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পৌছার আগ পর্যন্ত এই ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে তারা উভয়ে ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা উভয়েই নির্মম রক্তচোষা পশ্চাদ্ধাবন থেকে পলায়ন ও আত্মগোপনের বিভিন্ন প্রবাহে আলাদাভাবে পথচলা শুরু করেন। আর বিশেষ বাহিনী তথা মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের হাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর গুপ্তহত্যার ঘটনা-পরিস্থিতি তিনি তার পরিবারের স্বয়ং সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ আস্বাদনকারী সদস্যদের থেকে যেমন শুনেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন।

বিন লাদেন ও প্রসিদ্ধ আফগান নেতা হেকমতিয়ারের মধ্যকার সাক্ষাতের বিশেষ অংশটি এই পরিমান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, তাকে কেউ ভুলেও জটিল ও রহস্যপূর্ণ লোক বলে মনে করেনি। সকলেরই জানা যে, যেই নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের সময়ে অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও কঠোর বলে খ্যাতি লাভ করেছিল, বর্তমানে সে কাবুল সরকারের অধীনে দখলদার আমেরিকার লোকদের সাথে গিয়ে যুক্ত হয়ে গেছে এবং মুজাহিদদেরকে আত্মসমর্পন করে "শান্তির" আড়ালে দখলদারিত্বের চাকরীতে যোগদান করার আহবান জানাচ্ছে।

কোনাড় প্রদেশে উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সাথে হেকমতিয়ারের এক ধরনের অবস্থান ও বর্তমানে কাবুলে দখলদারদের সাথে তার আরেক ধরনের অবস্থান আমাদের সামনে অনেক কিছু স্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে তার কতক জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের কারণ ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে; বরঞ্চ আমরা বুঝতে পারছি যে, সঙ্কটপূর্ণ মূহুর্তের সাক্ষাতে বিন লাদেনের সাথে তার কর্কশ ও সংশয়মূলক আচরণের উদ্দেশ্যও সেটাই, যা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সংশয়কে জাগিয়ে তুলেছিল। ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা এমনটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠছে।

আমরা এ সফরে উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর এমন এক সন্তানের নিকট মেহমান হয়েছি, যিনি শাইখের সাথে অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় সবচাইতে বেশি সামঞ্জস্য রাখেন। কেমন যেন তিনি তার পিতার একটি ক্ষুদ্রাকৃতি। এমনকি তার বলনে, চলনে, নীরবতা ও স্থিরতাতেও। যিনি ৯/১১ এর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে কান্দাহার ত্যাগ করার পর থেকে নিয়ে পার্বত্য সীমান্ত পার হয়ে ২০০২ সালের বসন্তকালে পাকিস্তানে পৌছার আগ পর্যন্ত তার বাবার সাথে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়... বিভিন্ন জায়গায়... আমার সাথে বসে সে সকল দূর্বিসহ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতেন, যা দ্বারা আমরা খুব সহজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠতাম। নিচের এ কথাগুলোই তিনি বলেছিলেন...

-মুস্তফা হামিদ - আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী

কাবুল থেকে তোরাবোরা

বাবা (উসামা বিন লাদেন) কান্দাহার ত্যাগ করার পর কাবুলের উত্তরে কালকান গ্রামের প্রথম মহল্লায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি সাধারণতঃ পশ্চাদ্বর্তী মহল্লার মেহমানখানায় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। এমনিভাবে কাবুল ও 'মিস ঈনাক' প্রশিক্ষণশিবির এর মাঝে বিরতির জন্য রাজধানীর দক্ষিণ পার্শ্বে লোগার প্রদেশের প্রান্তবর্তী স্থানগুলোতে স্থানান্তরিত করা হতো। এভাবেই কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। শত্রুসাক্ষাৎের আশঙ্কা রয়েছে এমন স্থানগুলোকে নিশ্চিত করণের তত্ত্বাবধানে তিনি জালালাবাদের পাশে তোরাবোরা পর্বতেও যেতেন।

কাবুল পতনের দিন (১১ নভেম্বর ২০০১) আমার বাবা সেখানেই ছিলেন। অতঃপর তিনি তার কতক বিশ্বস্ত বন্ধুকে মিলিত করার লক্ষ্যে রাজধানী ছেড়ে জালালাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। যেমন পুরাতন মাঠ পর্যায়ের কমান্ডারদের মধ্য থেকে 'কমান্ডার আউয়াল গুল' ও 'ডঃ আমিন' এবং আল কায়েদার মধ্য থেকে 'আবু ওমর আল মাগরিবী"', 'মুহাম্মাদ ফাহিম' ও 'হামজা আল গামিদী' ও আরও অনেকে ছিলেন।

জালালাবাদ পতনের দিন (৬ ডিসেম্বর ২০০১) আমরা শহর ছেড়ে তোরাবোরা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন আমরা বাসে চড়লাম এবং লাইট না জালিয়ে এক রাত চললাম। আর আমাদের ড্রাইভার ছিল সেই হামজা আল গামিদী। এদিকে মার্কিন বিমান বাহিনী তখন শহরে বোম্বিং করে যাচ্ছিল।

পর্বতের পাদদেশে বাস থামিয়ে পদব্রজে আমরা ওপরে চড়তে লাগলাম। তিন ঘন্টা চলার পর আমরা আরবদের প্রথম ঘাঁটিতে পৌছি। তারা ছিল একটি প্রহরারত গ্রুপ। তাদের সাথেই আমরা রাত্রিযাপন করলাম। সকালবেলা নাস্তা সারার পর আমরা সূর্যোদয় থেকে নিয়ে আছর পর্যন্ত ক্রমাগত পর্বতে আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা আরব যুবকদের আরেকটি ঘাটিতে পৌছি। সেখানে আমরা গাছের নীচে একটি পরিখাতে বিশ্রাম গ্রহণ করি এবং অনেক কষ্টে আলু ও চাউল দ্বারা তৈরীকৃত একপ্রকার খানা লাভ করি।

বাবা ক্রমাগতভাবে ওপরে আরোহণ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এদিকে বরফ আমাদেরকে বেষ্টন করে নিচ্ছিল। একপর্যায়ে পাকিস্তান ঘেঁষা পার্বত্য অঞ্চলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমাদের অবস্থান এমন এক এলাকায় ছিল, যে এলাকা সীমান্তের দু'পাড়ে বসবাসরত ভিন্ন দুই উপজাতিকে আলাদা করে দেয়। আর আমরা ছিলাম মধ্যখানে। সেই এলাকাটি মৌলবী ইউনুস খালেস গ্রুপের শহীদ ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ সাহেবের অনুগামী ছিল। সেখানে আমরা এক সপ্তাহ বা তার চে' কম সময় অবস্থান করি।

বাবা চাচ্ছিলেন আমরা যেন কোন আফগানী রাহবার সাথে নিয়ে লাগাতার পর্বতে আরোহণ করতে থাকি। তাই আমরা মাঝে শুধু নামাজটুকু আদায় করে আসর থেকে ফজর পর্যন্ত প্রায় দশ ঘন্টা লাগাতার হাঁটলাম। এদিকে বাবার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য দুই উপজাতির একটির সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। আর তার সাথে ছিল প্রায় ত্রিশজনের মত যুবক। কাফেলার ভেতর ছিল ডঃ আইমান আয যাওয়াহিরী , সুলাইমান আবুল গাইস , আবু ওমর আল মাগরিবী ও হামজা আল গামিদী। আর তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমরা দু'জন ছিলাম। আমরা বাবার সঙ্গে থাকতাম ও বাবার সকল কাজে তাঁকে সাহায্য করতাম। ফজরের আগে আমরা এক গ্রামে পৌছলাম এবং গ্রামবাসী আমাদের ব্যাপারে কিছু টের পাওয়ার আগেই সেখান থেকে আমরা বের হওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলাম। কেননা সেক্ষেত্রে সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। পরিশেষে আমরা পর্বতে একটি নির্জন বাড়ীতে পৌছি এবং সেখানে আমরা যোহর পর্যন্ত ঘুমালাম। এই সুযোগে মেযবান আমাদের জন্য চমৎকার খানার আয়োজন করে ফেলেন। মধ্যরাত্রিতে ঘরওয়ালা আমাদের জন্য একটি ট্রাক উপস্থিত করলেন, যেন তা আমাদেরকে তাদের এলাকার পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা তখন

খুব ক্লান্ত ছিলাম। পর্বতের উপর আমরা দুই কামরা বিশিষ্ট একটি বাড়ী পেলাম। যা ভেড়ার খোঁয়াড় হিসেবে ব্যাবহৃত হত, তাই আমরা তাকে বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ পেলাম। যুবকরা তাকে তাদের পুশতু ভাষায় 'বাইতুল কিক' অর্থাৎ 'বিষ্ঠার বাড়ী' বলে নাম রেখেছিল। (বাবার অজান্তে আমি তাঁর ছবি তুলতাম। আমার কাছে একটি ক্যামেরা ছিল, দীর্ঘসময় যাবৎ আমি তা আমার সঙ্গে রাখতাম)। এক কামরায় আমি আমার বাবার সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে ছিল ডঃ আইমান আয যাওয়াহিরী ও সুলাইমান আবুল গাইস। আমার সহোদর অন্য কামরায় বাকি যুবকদের সাথে ঘুমিয়েছিল। এ অবস্থায়ই আমরা এক সপ্তাহের কাছাকাছি ছিলাম এবং আমাদের সাথে কোন আফগানী ছিলনা।

ফজরের সময় আমাদের নিকট ডঃ আইমানের সহধর্মিণী ও তার সন্তানদের এবং মুহাম্মাদ সালাহ্ ও আব্দুল হাদী আল উরদুনী ভাইয়ের শাহাদাতবরণের সংবাদ পৌছে। বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা তোরাবোরা পর্বতে ফিরে যাবো এবং ডঃ আইমানের নিকট প্রস্তাব রাখলেন যে, তিনি তার পরিবারের ইন্তিকালের কারণে যে ধাক্কা খেয়েছেন সেজন্যে যেন তিনি এক দিনের জন্য বিরতি গ্রহণ করেন। তার সাথে যুবকদের একটি দল রেখে যান এবং যুবকদের আরেক দল বাবার সাথে চলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমরা তোরাবোরা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আর এটা ছিল আমাদের জন্য একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা আমরা সিংহের মুখে ফিরে যাচ্ছিলাম।

পথিমধ্যে আমরা বিমান দ্বারা বোম্বিংয়ের শিকার হলাম। একটি বোমা আমাদের থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে এসে পড়লো। তখন বাবা স্বস্থানেই বসে গেলেন। তার সামনে আমি বসা ছিলাম। যুবকরা সে জাগায় ছড়িয়ে পড়ল। ধূম্রাচ্ছন্নতা থেমে গেলে আমরা ভাইদের প্রতিরক্ষা লাইন পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখি। একদিন বা দুইদিন পর আমরা সেখানে ডঃ আইমানের দেখা পাই।

১৭ই রমাদান (৬ই ডিসেম্বর) থেকে তোরাবোরা পর্বতের ওপর বিমান হামলা করা হতো গণহত্যামূলকভাবে। ইতিপূর্বে সেখানে গোলাবর্ষণ ঘনীভূতাকারে সব জায়গায় না করে বিক্ষিপ্তভাবে করা হতো। তখনকার সেই দীর্ঘদিনের বর্বরোচিত বিমান হামলা চালানো সত্ত্বেও তোড়াবোড়া পর্বতে আরব শুহাদাদের সংখ্যা দশেরও কম ছিল। অথচ সেখানে তাদের মোট সদস্য ছিল ৩১৩ জন।

আমরা তোরাবোরা'র শীর্ষ উঁচুর কাছাকাছি সেখানে ছিলাম, শত্রুপক্ষের জন্য যেখানে পৌছা সম্ভাবপর ছিল। পর্বতকে ঘিরে রেখেছিলেন স্থানীয় কমান্ডার 'যামান', 'হযরত আলী' ও 'কমান্ডার আউয়াল গুল'। আর বাবার যারা বন্ধু ছিলেন তারা গঠনগতভাবে কমান্ডার 'যামান' এর সাথে মিলে গিয়েছিলেন বাবার ধার্যকৃত শর্ত পূরণে। তা হচ্ছে, আমাদের নিকট 'মুহাম্মাদ ফাহিম' গোপন লিংকের মাধ্যমে শত্রুভাবাপন্ন বাহিনীর সংবাদ পাঠাবেন।

B৫২ ফাইটার আমাদের উপর দিনের বেলা ও F১৬ ফাইটার আমাদের উপর রাতের বেলা ক্রমাগতভাবে বোম্বিং করতে থাকতো। প্রথমটি আসতে যেতে পর্বতের উভয়পার্শ্বে বোম্বিং করতো। যুবকরা বোমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এক পাশ থেকে আরেক পাশে দৌড়াদৌড়ি করতো।

উসামা বিন লাদেনের পরিখাতে একটি স্লাইড

আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে একটি পরিখা ছিল। যার প্রশস্ততা ছিল আনুমানিক ২×৩ মিটার। যা বাবা আবুল গাইস ও ডঃ আইমান সহকারে ব্যাবহার করতেন। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাকে সালাম জানানোর দাবিতে আমাদের নিকট এলাকার কয়েকজন লোক আসে। (কিন্তু তারা গোপনে একটি ইলেকট্রিক স্লাইড রেখে যায়, সে জায়গার প্রতি বিমানকে পথনির্দেশ করার জন্য)। তাদের চলে যাওয়ার পর বাবা চাইলেন যে, আমরা যেন এ জায়গা ছেড়ে দেই এবং এখান থেকে দূরে পর্বতের কোথাও আরোহণ করি। সেখানে গিয়ে তিনি ঘুমালেন। বিমান এসে আর কোন প্রকার দেরি করলো না; এসেই আমরা ইতিপূর্বে যে স্থান ছেড়ে এসেছি সেখানে গোলাবর্ষণ করে। তখন বাবা একজন লোক প্রেরণ করলেন বোম্বিংয়ের পরিণাম অনুসন্ধান করার জন্য। ফিরে এসে অনুসন্ধানকারী জানালো যে, বিমান এসে সাত টন ওজনের একটি বোমা ফেলে পর্বতে বিশালাকারের একটি গর্ত তৈরী করে ফেলেছে। আঘাতটি সরাসরি বাবার পরিখাতে এসে লাগে। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে ছিল।

(২৭ই রমাদান ১৬ই ডিসেম্বর) দু'দিন আগে রেডিও যোগে আমাদের নিকট আবু হাফস আল মিসরীর শাহাদাতবরণের সংবাদ পৌছে। সেদিন বাবা আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি এবং আমার ভাই যেন এ এলাকা ছেড়ে চলে যাই। আমি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি ও বলি যে, বরং আমার ভাই চলে যাক, আমি আপনার

সাথে থাকবো। বাবা আমাকেও চলে যাওয়ার জন্য অনেক জোর দিলেন। অতঃপর তিনি অল্প সময়ের জন্য আমাদের ছেড়ে বাহিরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, তোমরা তিনজনই চলে যাবে; তুমি, ডঃ আইমান ও আবুল গাইস। তখন আমরা এক অজানা পথের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম এবং সেখানে বাবার অপেক্ষা করছিলাম। আসরের সময় আমরা তিনজন একজন আফগানী রাহবারসহ এস্থান ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বাবা আমাকে বিদায় জানানোর জন্য এলেন। তখন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও আমার কপালে চুমু খেলেন। এতে আমার মনে ধাক্কা লাগে। কেননা তিনি এতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আর আমার ভাইদের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই সন্তান, যার কপালে আমার বাবা চুমু খেয়েছেন। ভয়ের এই দিনগুলোতে আমিই ছিলাম তার নিজস্ব খাদেম, আমিই তার প্রয়োজন পূরণে তাকে দেখাশোনা করতাম।

তোরাবোরা পর্বত জালালাবাদের দিক দিয়ে অবরুদ্ধ ছিল। অন্ধকারের ভেতর আমরা পর্বতের আফগানী অংশের দিকে নেমে আসি, যা মন্ত্রী উপজাতিদের অধিনস্থ ছিল। এ উপজাতির কয়েকজন সদস্য আমাদেরকে পালিয়ে তাদের গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। গ্রাম অভিমুখী হয়ে আমাদের নেমে আসার সময় আহমাদ শাহ্ মাসউদের লোকেরা আমাদেরকে প্রায় পেয়ে বসেছিল। তারা প্রহরার কাজে টহল দিচ্ছিল। তাদের গাড়ীর আলো আমাদের গায়ে এসে লাগার উপক্রম হয়। তখন আমরা দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ি। পর্বতের উপরে থাকাবস্থা থেকেই আমার পা আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। পর্বতের ওপর থেকে আছড়ে পড়া পানির নালা পাড় হওয়ার সময় ডঃ আইমানের চশমা পড়ে যায়। কিন্তু অন্ধকারের কারণে আমাদের পক্ষে সেটার আর কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়না। পরিশেষে আমরা একটি গোপন বাড়ীতে পৌছি, যা প্রস্তুত করেছিল সেই উপজাতির লোকেরা। সেখানে আমরা একরাত ঘুমাই।

(১৭ই ডিসেম্বর) সকালবেলা তারা আমাদের জন্য একটি পিকআপের ব্যাবস্থা করে দিল। তা আমাদেরকে এবড়োথেবড়ো পথ দিয়ে জালালাবাদের পাশ দিয়ে নিয়ে যায়, অতঃপর সেখান থেকে সরাসরি কোনাড় প্রদেশের দিকে বাঁক ঘুরে। পরিশেষে আমরা কোনাড় প্রদেশের প্রধান নগরী (আসাদাবাদে) পৌছি। এবং সেখানে একটি গোপন বাড়ীতে আত্মগোপন করি।

(১৯ই ডিসেম্বর) ঈদুল ফিতরের দিন ফজরের একটু পূর্বে আমাদের নিকট একজন আফগানী যুবক এসে আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, উসামা বিন লাদেন এসেছেন। কয়েক সেকেন্ড পরই আমাদের নিকট বাবা প্রবেশ করলেন। আমরা শুকরিয়ার্থে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বাবাকে বললামঃ আমরা একই দিনে দুইটি ঈদ লাভ করেছি; ফিতরের ঈদ ও আমাদের নিকট আপনার নিরাপদে ফিরে আসার ঈদ।

যিনি আমাদের নিকট বাবাকে হাজির করলেন তিনি হলেন, 'উস্তাদ আউয়াল গুল'। যিনি নিজের (কালো ছায়াচ্ছন্ন সাদা ল্যান্ডক্রোজ) গাড়ীতে করে বাবাকে কোনাড় প্রদেশের সীমান্তে নিয়ে এসেছেন এবং সেখানে যুবকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। বাবা আমাদের সঙ্গে সেই গোপন বাড়ীতেই থেকে গেলেন। শীত আমাদের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনকি আমরা বরফকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আগুন প্রজ্জলিত করতে পারছিলাম না। কেননা সেক্ষেত্রে মানুষেরা এ বাড়িতে কারো বিদ্যমান থাকার কথা বুঝে ফেলবে।

হেকমতিয়ারের আগমন

খালেদ আশ্-শাইখ ও পাকিস্তানস্থ তার দলের সহায়তায় প্রায় তিনমাস পর ২০০২ সালের মার্চ মাসে আমাদের নিকট হেকমতিয়ারের আগমন ঘটে। খালেদ ছিলেন বাবা ও পাকিস্তানের যারা বাবার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের মধ্যকার সংযোগ মাধ্যম। হেকমতিয়ার একটি ভিন্ন বাড়িতে একাকী থাকার জন্য চলে যায়। সে আমাদের নিকট এলেও আমাদের থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাবা, ডঃ আইমান ও আবুল গাইসের সাথে কথা বলতো। আমরা তাদের থেকে দুরত্ব বজায় রেখে বসতাম। তথাপি আমরা তাদের মাঝে টেনশন, উত্তেজনা ও টানাপড়েন উপলব্ধি করতাম। অতঃপর হেকমতিয়ার আবার আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার ভিন্ন বাড়িতে চলে যেত। তার সাথে কথা বলার জন্য বাবা আবুল গাইসকে পাঠাতেন। অতঃপর তিনি হেকমতিয়ারের অপ্রত্যাশিত কথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসতেন। হেকমতিয়ার একবার আমাদের গোপন বাড়িতে আমাদের এক সাক্ষাৎে বাবার মুখের ওপর একটি বিস্ফোরণ ঘটায় এ কথা বলে যে, (এখানে আমির আমিই, তুমি নও... সুতরাং কান্দাহারে তুমি তোমাকে ভেবো না)।

হেকমতিয়ার নিয়মিতভাবে আমাদের গোপন বাড়ির আঙ্গিনায় আসতে শুরু করে, তারপর সে টেলিফোন যোগে কথা বলা শুরু করে। বাবা তাকে এসব করতে নিষেধ করেন, কেননা এটা তাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। কিন্তু হেকমতিয়ার অমান্য করে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

এই টানাপড়েন সম্পর্ক সত্ত্বেও হেকমতিয়ার একদিন একটি হাদিয়া নিয়ে আসে। আর তা হল, একটি ঘড়ি এনে সে কামরার মাঝখানে একটি টেবিলে রাখে। তখন বাবা বলে ওঠে, না.. না আমরা এটা চাইনা...। তখন হেকমতিয়ার ঘড়িটা ফিরিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে আমাদের নিকট সে বারংবার আসা-যাওয়া করতে লাগে।

অতিশয় গুপ্ত

আমরা পর্বতে থাকাবস্থায় খালেদ আশ্-শাইখ আমাদের নিকট একটি কম্পিউটার ও উপরে 'অতিশয় গুপ্ত' লেখা একটি অন্তর্নির্মিত ডিস্ক প্রেরণ করে। বাবা বললেন, আজব জিনিস তো!! তোমরা দেখেনা, আমি একাই দেখছি। অতঃপর দেখা গেল যে, তা রিপোর্টার "ইউসরি ফাউদা" (Yosri Fouda) এর 'অতিশয় গুপ্ত' নামে একটি তথ্যসংক্রান্ত প্রোগ্রাম। ভিডিওটি আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম এবং প্রথমবারের মতো গোয়েন্তানামোর বন্দি ভাইদের চিত্র প্রত্যক্ষ করলাম। বাবার নির্দেশে হামজা আল গামিদী আমাদের ছেড়ে চলে যান। আর বাবার সাথে আমি, আমার ভাই, আবুল গাইস, ডঃ আইমান ও আবু বাছির থেকে যাই। আমরা খানা পাকানো ও জীবিকা নির্বাহর দায়িত্ব বন্টন করে নিয়েছিলাম। আমার ভাইয়ের পালা এলে আমি এবং সে দু'জন মিলে অন্যদের একদিনের কাজ করতাম। আমাদের কেউ দেখে ফেলে না মতো দুটি পাত্রে করে পানি আনার জন্য উপত্যকায় নেমে আসতাম এবং উপরে আরোহণের সময় তীব্র শীতের রাত্রিতে তা আমাদের শরীরে গড়িয়ে পড়তো। আমাদের দৈনিক তিনবেলা খানা প্রস্তুত করা হতো। কোন একদিন আমরা ইফতারিতে মা'সুবা তৈরী করি। এটা একটি সৌদি খাবার। আর তা হল ময়দার কাই, যার মাঝে মধু ও ঘি থাকে। ডঃ আইমান তা খেতে অস্বীকৃতি জানান ও বলেন, এটা দেশীয় খাবার নয়। সকালবেলা আমরা কয়েকটি লাউ ও আলু পাই। তা দ্বারা আমি স্যুপ তৈরী করেছিলাম, তাতে বাবা অনেক খুশি হয়েছিলেন। আমাদের সাথে যারা ছিল তারা সবাই চলে গেল এবং শুধুমাত্র আমরা তিনজন বাকি রয়ে গেলাম; আমি, বাবা ও ডঃ আইমান। বাবা আশঙ্কাবোধ

করলেন যে, যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তাদের কেউ বন্দি হয়ে শত্রুদেরকে বাড়ির অবস্থান বলে দিবে। তাই আমরা আমাদের অবস্থান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সফর করি এবং অন্যান্য দলের নিকট আত্মগোপন করি। হেকমতিয়ার আমাদের সঙ্গে সবেমাত্র যুক্ত হল!! আর ওমনি বলে ওঠলো, বিমান এসে সেই এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে যেখানে তোমরা ছিলে!!

হেকমতিয়ার পর্বতের চূড়ায় আমাদের সামনা-সামনি একটি বাড়িতে থাকতো এবং মাঝে মাঝে আমাদের এখানেও আসতো। একদিন সকালে সে তার বাড়ি ছেড়ে পর্বত বেয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। একজন আফগানী আমাদেরকে জানাল যে, সে যেই পর্বতে থাকতো মার্কিনিরা সেই পর্বতে হামলা করেছে।

তিক্ত মধু

পর্বতের ওপর আমরা তিনজন এক কামড়াতে থাকতাম। একবার ডঃ আইমান ও বাবার মাঝে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। হেতুটি ছিল এই যে, বাবা পাকিস্তানী কুলফলের মধু ক্রয় করলেন। তখন ডঃ আইমান ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "আমাদের জন্যে মুজাহিদদের টাকায় মধু ক্রয় করা জায়েয নেই"। তখন বাবা বললেন, আসুন... আল্লাহর দয়ায় জিহাদ শুরু হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি মুজাহিদদের একটি টাকাও নিজের ও নিজের সন্তানদের পিছনে খরচ করিনি। এই মধু আমি আমার ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। তখন ডঃ আইমান চুপ হয়ে গেলেন, বাবার কথায় আর কোন মন্তব্য করলেন না।

এ অবস্থায় আমরা কিছু সময় বসে রইলাম। সেদিনই আমাদের বাড়িতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। সে সকলের নিকট পরিচয় দিচ্ছে যে, সে আবু আহমাদ আল কুওয়াইতী। এবং সে বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার অপেক্ষায় আমাদের বাড়ি থেকে একটু উপরের একটি বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। বাবা আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তার কাছে গিয়ে তার পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হই। আমি গিয়ে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই তিনি আবু আহমাদ। আমি বাবাকে সংবাদ দিলে বাবা তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত তার উপস্থিতি কামনা করলেন।

স্থায়ীত্বের স্বপ্ন বাষ্পে পরিণত হওয়া!

এতক্ষণে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায় এবং মার্কিনিরা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমরা আমাদের বর্তমান আশ্রয়স্থলেই থেকে যাব বলে বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সে এলাকাতেই ভবিষ্যৎকালীন স্থায়ীত্বের মতো করে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যেই আমাদের আফগানী মেযবানদের সহিত তিনি আলোচনা প্রস্তাবনা করে ফেলেন যে, তারা যেন আমাদের জন্য কোনাড় প্রদেশে একটি বাড়ি তৈরী করে দেন এবং তাদের সামনে তিনি বাড়ির একটি নকশাও তুলে ধরেন। এটাই সেই নকশা, যা পরবর্তীতে আবোটাবাদের বাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল। যেই ডিজাইনটি দৃষ্টিবিভ্রমের ওপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছিল।

অতঃপর তিনি তাদেরকে দখলদারদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এবং কার্যত পরবর্তীতে তারা মার্কিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা তাদেরকে ছেড়ে চলে আসবো এতে কোনক্রমেই তারা আগ্রহী ছিলো না। বাবা তাদেরকে টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করালে তখন তারা আমাদেরকে যাবার অনুমতি দেয়। বাবা তাদের হাতের ওপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, যখন আফগানিস্তান ও সৌদী আরব মুক্ত হবে তখন তিনি মক্কায় হেরেম শরিফের নিকটে তাদের জন্যে একটি বাড়ি তৈরী করে দিবেন।

এর কয়েকদিন পরই আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্তদের প্রধান "মুহাম্মাদ ফাহিম" আমাদের নিকট জালালাবাদ থেকে খবরাখবর নিয়ে আসেন। বাবা তাকে দখলদার বিরোধী যুদ্ধের তৎপরতায় অর্থায়ন করার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার প্রদান করেন ও তাঁর জন্য কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। ইতিমধ্যে সেগুলোর কয়েকটি বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বাবা সেগুলোর একটি শোনার সময়, -যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল- শুকরিয়ার্থে আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। এটি ছিল জালালাবাদে আরবদের প্রতি নির্যাতনের কিয়দংশের প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু এর কিছুকাল পর "ফাহিম" নিজেও শাহাদাত বরণ করেন।

মূহুর্তের ভেতর কোনাড় প্রদেশের পর্বতে আমাদের বাড়ি তৈরী করা ও তাতে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল, কেননা ইতিমধ্যেই আমাদের এলাকাতেও মার্কিনিরা পৌছে গেছে। আমাদের নিকট সতর্কসংকেত নিয়ে এসেছে এমন এক আফগানী, যিনি তার হাতে থাকা ওয়ার্লেসে নিন্দা জানাতে জানাতে বিস্ফোরিত

নেত্রে আমাদের নিকট প্রবেশ করেছিলেন। লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদেরকে সংবাদ দিল যে, আমরা পর্বতের নিম্নবর্তী যে সকল উপত্যকাগুলোতে আত্মগোপন করতাম, মার্কিনিরা সেখানে দিয়ে অতিক্রমণ করছে ও সেগুলোতে তারা তাদের সাজ-সরঞ্জামাদি নিয়ে অত্যন্ত তীব্রতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

অবস্থানটি ছিল প্রচন্ড সঙ্কটপূর্ণ!! আমরা সর্বোচ্চ গতিতে জুতা পরিধান করি ও অস্ত্র ধারণ করি এবং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে থাকি। এমনকি তুষার আর না থাকা সত্ত্বেও আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা আমেরিকার 'হামির' গাড়িগুলোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সেগুলো আমাদের নিম্নভাগের উপত্যকা দিয়ে অতিক্রমণ করছিল। গাড়ির বহর চলে যাওয়া আগ পর্যন্ত আমরা গাছের আড়ালে বসে থাকি। অতঃপর আবার ওপরে চড়া অব্যাহত রাখলাম। বাবা আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, শত্রুরা আমাদের দিকে ফায়ার করা ব্যতিত আমরা যেন তাদের দিকে ফায়ার না করি। তখন ডঃ আইমান বললেন, আমি কিছুতেই পূণরায় কারাবন্দী হবো না।

আমরা পর্বতের ভাঁজগুলো দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওপরে আরোহণ অব্যাহত রাখছিলাম। সে এলাকার বন্ধুরা আমাদের আত্মগোপন করার জন্য একটি জায়গা অনুসন্ধান করছিল। অতঃপর তারা একটি বিরাটকায় গাছ পেল। সেটিকে তারা ভূপৃষ্ঠের সাথে ধনুক বানিয়ে কাটলো। যেন শিকড় ও জমিন মিলে এমন একটি পরিখার আকার ধারণ করে, যার নীচে প্রলম্বিতভাবে একজন মানুষ শুতে পারে। বাবা ও ডঃ আইমান তাতে প্রবেশ করেন এবং তাদের পায়ের নীচে আমি শুয়ে পড়ি। আমাদের আফগানী সঙ্গীরা মার্কিনীদের প্রতারিত করার জন্য ঘাস দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে দেন। তখন কোন বিমান আসেনি ঠিকই; কিন্তু তাদের পদাতিক সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামাদি দ্বারা পুরা উপত্যকা ছেয়ে গিয়েছিল এবং তারা সরাসরি সেই পর্বতেরই নীচে অবস্থান করছিল, যে পর্বতে আমরা অবস্থান করছিলাম। আমরা এইভাবে এই শিয়ালের গর্তে দুইদিন আত্মগোপন করে থাকি। ফজর থেকে মাগরিবের পর পর্যন্ত কোনরকম খানাপিনা ও প্রকৃতির ডাকে সাড়াদান ব্যতিত। (বাবার সেই ছদ্ম আবরণ দ্বারা গোপনকৃত গর্ত থেকে বের হওয়ার চিত্রটি আমি ভিডিও আকারে ধারণ করেছিলাম। ভিডিও ক্লিপটি **مؤسسة السحاب للإعلام** – আস সাহাব মিডিয়ার প্রকাশনাগুলোর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।)

পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর আফগানীরা আমাদেরকে সংবাদ দিলো যে, শত্রুরা চলে গেছে এবং এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। আমরা পর্বত থেকে নীচে অবতরণ করা আরম্ভ করলাম এবং তা দিবসের প্রথম প্রহর থেকে নিয়ে প্রায় যোহর পর্যন্ত চলতে থাকে। (আমি বাবা ও ডঃ আইমানের সেই পর্বত থেকে নেমে আসার দৃশ্যটি ছবি তুলে রেখেছিলাম। যা বিশ্বব্যাপী তোরাবোরা পর্বতের নামে ছড়িয়ে পড়েছে)।

সেখান থেকে নেমেই আমরা দ্রুত সামনের পর্বতে চড়া শুরু করি, যার শেষ পাদদেশে পাকিস্তান অবস্থিত। এবং আমাদের ক্রমাগত আরোহণ ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পর্বতটির শৃঙ্গ অত্যন্ত সুউচ্চ ও ভয়ঙ্কর ছিল। কেননা তা এই পরিমাণ উঁচু ছিল যে, আরোহণকালে আমরা মেঘের ভেতর প্রবেশ করে ফেলেছিলাম। ফলে আমাদের দাড়ি ও পোষাকগুলো ভিজে গিয়েছিলো। আমাদের সাথে তখন একজন বা দুইজন আফগানী ছিল এবং খাবার ছিল অত্যন্ত স্বল্প। আমরা এমন একটি গ্রামের পার্শ্ব ঘেষে অতিক্রম করলাম, যা পর্বতের শেষ তৃতীয়াংশে অবস্থিত। আমরা সেটিকে এড়িয়ে চললাম ও আমাদের আরোহণ পর্বতের ঠিক চূড়ায় পৌছা পর্যন্ত অব্যাহত রইল। আমরা সকলেই ছিলাম ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাই বাবা বললেন, "আমরা কিছুটা বিশ্রাম নিব, তারপর সফর চালিয়ে যাব"। তাই আমরা গাছের নীচে একটি জায়গা ঠিক করলাম, যেন সেখানে আমরা টানটান হয়ে শুতে পারি। (এ সকল ঘটনার সবকিছুই আমার সাথে থাকা ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত ছিল, বৃষ্টির সময় আমি তা আমার নীচে বা আমার জামার ভেতর লুকিয়ে রাখতাম)।

আমাদের বিশ্রাম শুরু করার দশমিনিট পর আমাদের ওপর মুষলধারে তীব্র বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। আমরা এই পরিমাণ ক্লান্ত ছিলাম যে, আমরা নিজেদের জায়গা থেকে উঠে দাড়াতে পারছিলাম না। ক্যামেরাটি আমি আমার নীচে লুকিয়ে নিলাম যেন তা নষ্ট না হয়। ফজরের সময় বৃষ্টি থেমে গেলে আমরা সূর্যোদয় পর্যন্ত সফর চালিয়ে যাই। আমাদের আফগানী সঙ্গীরা আমাদেরকে এ কথা বলে সান্তনা দিচ্ছিল যে, গন্তব্যস্থল সন্নিকটে।

পাকিস্তানের ধাপ

অতঃপর এখান থেকে তো সম্পূর্ণরূপে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আমরা পর্বতের পাকিস্তান প্রান্তে অবস্থান করছিলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদেরকে ক্লান্ত

বানিয়ে ফেলেছিল। তখন আমরা পর্বতের সঙ্কীর্ণ গিরিপথের পাশে একটি শিলাখন্ডের সন্ধান পাই। যা ধনুকাকৃতির এমন ছিল যে, সে তার অভ্যন্তরে পানি সংরক্ষণ করে রাখতো। ফলে আমরা তা পান করলাম এবং সফর চালিয়ে গেলাম। আমাদের সফর পূর্ণ একদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর মাঝে আমরা আধঘণ্টার বেশী বিরতি দেইনি। যোহরের দিকে আমরা আত্মগোপন ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একটি বাড়িতে উঠি। তারা আমাদেরকে এমন একটি কামড়ায় প্রবেশ করালো, যা বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। কামড়াটি সার্বক্ষণিকভাবে তাদের উৎকট গন্ধে পরিপূর্ণ থাকতো। সেখানে আমরা খালেদ আশ্ শাইখের (মুখতারের) অপেক্ষায় ছিলাম। এ যাবৎ আমরা পর্বতের ওপরেই আছি, গাড়ির রাস্তায় পৌছতে আমাদের আরো আধঘণ্টা সময় লাগবে। আফগান সঙ্গীরা খুব টেনশন করছিলেন ও বলছিলেন যে, মার্কিনিরা পর্বতের নীচে অবস্থান করছে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতক আফগানীরাও রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে সতর্ক করছি যে, আপনারা নীচে অবতরণ করবেন না। বাবা আমাকে রাস্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য নামার নির্দেশ দিলেন। একজন আফগানী আমার সঙ্গে ছিল। এবং যদি কোন সমস্যা হয়ে যায় ও আমি যদি গ্রেফতার হয়ে যাই, তাহলে যেন আমি সংবাদ পাঠাতে পারি এজন্য আমাকে একটি সম্মতিপূর্ণ সঙ্কেত দিয়ে পাঠালেন।

আমি নীচে নামলাম; কিন্তু তাদের কথানুযায়ী কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন বাবা ও ডঃ আইমান পর্বতের ওপর থেকে নেমে এলেন। এখানে মুখতার আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি "পাজারু" গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা দিনের বেলায়ই পেশোয়ার শহরে প্রবেশ করি এবং একটি বাড়িতে আমার বিমাতা ও আমার সৎ বোন পৌছার আগপর্যন্ত একদিন বা দুইদিন অবস্থান করি। সেই সঙ্কটপূর্ণ সফর শেষে বাবা আমার নিকট এলেন ও বললেন, "এখন তোমার বিবাহের সময় হয়েছে, প্রস্তুতি নাও!"। আমি অসম্মতি জানালে তিনি সুদানি ভাষায় আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "ইয়া জাওল... ইয়া জাওল... দায়িরিনা নাশুফু আওলাকা ইয়া জাওল!"। অর্থাৎ "হায়রে আশ্চর্য! হায়রে আশ্চর্য! আমরা এখন তোমার সন্তাদের দেখে যেতে চাই! বুঝলে!"

তখন আমি সম্মতি দিলাম। অতঃপর আমার সঙ্গ দেওয়ার জন্য যুবকরা এসে উপস্থিত হলো এবং বাবা আমার হাতে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে বললেন, "এই নাও! বিবাহের কার্যাদিতে এর দ্বারা সহায়তা নাও!"। বাবাকে ছেড়ে আমি অন্যত্র

সফর শুরু করি। ইতিপূর্বেই বাবা নিরাপত্তার স্বার্থে ডঃ আইমান থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দলে বিভক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মুস্তফা হামিদের কথা ও ডায়েরির সর্বশেষ পাতা!

মুস্তফা হামিদঃ যুবক তার বাবা ওসামা বিন লাদেনকে ছেড়ে আসার পর নিজের ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। প্রথমে তিনি সফর শুরু করেন পেশোয়ার থেকে লাহোর, অত:পর রাওয়ালপিন্ডি, অতঃপর করাচী, অতপর কোয়েটা... এবং সর্বশেষ ইরান... যেখানে গ্রেফতার, কারাগার এবং বহু রুক্ষ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। পরিশেষে আমাদের নিয়ে পূনরায় তার বাবার ওখানে আবোটাবাদে ফিরে আসেন এবং আমেরিকা সেখানে যে সকল দুষ্কর্ম সাধন করেছে সেগুলো বর্ণনা করেন। আর এগুলো তিনি পরিবারের সেই কষ্ট ভোগকারী সদস্যদের নিকট থেকে যেভাবে শুনেছেন সেভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইনি আল্লাহর বান্দা: আবোটাবাদ... সফরের শেষ প্রান্ত!

(২০১১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় ভোর) সে রাত্রিতে বাবা উসামা বিন লাদেন সেই বাড়ির তৃতীয় তলায় অবস্থান করছিলেন, যা একটি বাগানসহ তিনতলা বিশিষ্ট করে তৈরী করা হয়েছিল। যে বাগানের ভেতর পাহারাদারের জন্য একটি ঘর ছিল। ফজরের পূর্বে বাবা নীচতলা থেকে ভেসে আসা একটি অপরিচিত শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তার ছেলে খালিদকে নীচে নেমে বিষয়টি উদ্ঘাটন করার জন্য বললেন। কিন্তু খালেদ উপরে তার নিকট আর ফিরে আসেনি।

যে আওয়াজটি বিন লাদেনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল তা ছিল সে বাড়িতে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের আক্রমণের আওয়াজ। তারা অবতরণের কাজটি সম্পন্ন করেছিল দুটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে। সৈন্যরা বাড়ির ওপর ও নীচ উভয় দিক থেকে হামলা করেছিল। হেলিকপ্টারটিও ছিল বিশেষ ধরণের, যা উড্ডয়নের সময় কোন শব্দ করে না এবং যে অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্যবহার করেছিল সেগুলোও ছিল সাইলেন্সার। একারণে সামগ্রিকভাবে অপারেশনটি সম্পন্ন করা হয়েছিল নীরবতার মধ্য দিয়ে এবং তারা কারো সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য কোন সুযোগ রাখেনি। বাড়ির লোকজন ও এলাকার পার্শবর্তী লোকেরা একমাত্র যে আওয়াজ শুনেছে তা হল, বাড়ির ভেতর অপারেশন চলাকালীন সময়ে বা অপারেশনের শেষের দিকে একটি

হামলাকারী হেলিকপ্টারের বিস্ফোরিত হওয়ার আওয়াজ। এবং সে আওয়াজটি স্বল্প সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

খালিদ যখন নীচতলায় অবতরণ করেছিল তখন আক্রমণকারীরা তাকে তৎক্ষনাতই ফায়ার করে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর তারা তিনতলায় আরোহণ করে তাতে প্রবেশ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাবার ওপর ফায়ার করে। ফলে তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়েন। বিন লাদেন সে সময় কোন অস্ত্রও হাতে নিয়েছিলেন না। তার স্ত্রী ঘাতক সৈন্যের অস্ত্র আটকে ধরে রেখেছিলেন ও তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে তাকে আঘাত করে মাটিতে ছুড়ে মারে। অতঃপর তাঁর ওপর ফায়ার করে, গুলি তাঁর হাঁটুতে লেগেছিল এবং এখন পর্যন্ত তিনি সেই পা ঘুড়াতে পারেন না।

সৈন্যরা মহিলা ও শিশুদেরকে পিছন থেকে হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে একটি রুমে একত্রিত করে। অতঃপর তারা বাবার মৃতদেহ এনে তাদের পিছনে প্রলম্বিত করে রেখে দিয়ে তাদেরকে ঘুরে দেখতে নির্দেশ দিল ও তাদেরকে প্রশ্ন করল যে, "ইনি কে??" তারা সকলে এই বলে প্রতিউত্তর করলেন যে, "ইনি আল্লাহর বান্দা"। তারা তাদেরকে পূনরায় দেয়ালের দিকে ফিরার নির্দেশ দিল। অতপর তারা খালিদের মৃতদেহকে স্বস্থানে ফেলে রেখে বাবার মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল।

পাকিস্তানিরা এসে মহিলা ও শিশুদেরকে নিয়ে গেল। খালিদের মা চলে যাওয়ার আগে খালিদের মৃতদেহের প্রতি ঝুঁকে তার কপালে চুমু খেলেন... অতঃপর চলে গেলেন।

বাড়ির আঙ্গিনায় খানিকটা বর্ধিতাংশ ছিল। তাতে পাহারাদার তার বিবি-সন্তানের পরিবার নিয়ে বসবাস করতো। সেই রাত্রিতে তার একজন নিকটাত্মীয় মেহমান ছিল। সেই পাহারাদারই হলেন, আবু আহমাদ আল কুওয়াইতী। হামলাকারীরা তাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলেছে এবং পিছনে জিবীত কাউকে ছেড়ে যায়নি। অতঃপর তারা তাদের অবশিষ্ট হেলিকপ্টার দিয়ে চলে গেল... এবং রক্ত ও মৃতের গন্ধে পরিপূর্ণ স্থান স্তব্ধ হয়ে গেল।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৯১৫

সালাহুদ্দীন আল আইয়ুবির জেরুজালেম বিজয়

mdasad

Member

০৩-২৯-২০১৮

ইসলামী ইতিহাস:

|| সালাউদ্দিন আল আয়ুবির জেরুজালেম বিজয় - শাইখ ওমার সুলেইমান ||

রাসূল (সঃ) যেমন বলেছেন- প্রতি একশ বছরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একজন মুজাদ্দিদ পাঠান। তিনি একজন পুনর্জাগরণকারী পাঠান। ঠিক সেই বছর সালাউদ্দিন আয়ুবি (র) জন্মগ্রহণ করেন। আরব বিশ্বের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। আর আসলে তিনি নিজেও আরব ছিলেন না, তিনি ছিলেন কুর্দি। সালাউদ্দিন জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তাঁর মা (র) একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন - আমি স্বপ্নে দেখি যে আমার গর্ভে একটি তরবারি ধারণ করে আছি। সুবহানাল্লাহ। তো, সালাউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নুরুদ্দিন (র) এর কাছে লালিত পালিত হন।

সালাউদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন যে আগামী কাল (খুব দ্রুত) জেরুজালেম বিজয় করা সম্ভব নয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি আবেগতাড়িত হয়ে কোন পদক্ষেপ নেন নি। আল কুদসে আক্রমণ করার পূর্বে তিনি মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করেন। তিনি মুসলমানদের পত্র লিখতে শুরু করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র পত্র পাঠাতে লাগলেন। তাদের মনে করিয়ে দিলেন আল্লাহ সুব হানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা। আকিদা এবং ফিকহের উপর তিনি মিশরে সাপ্তাহিক ক্লাস নিতেন। তিনি পুনরায় রাসুলের দেখানো নিয়মে আযান দেয়ার পদ্ধতি চালু করেন। তিনি তাদেরকে পুনরায় সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

তারপর তিনি যখন মুসলিম বিশ্বের হৃদয় জয় করেন, তিনি তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করেন। তারপর তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। তিনি একটার পর একটা শহর জয় করতে লাগলেন। তিনি শুধু মুসলমানদের নয়, অমুসলিমদের মনও জয় করলেন। কারণ তিনি কুফফারদের মত ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করেন নি।

এভাবে যখন তিনি শহরগুলোকে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি মহিলা এবং শিশুদের রেহাই দেন। তিনি নিরপরাধ লোকদের ছেড়ে দেন। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অপরাধীদেরও ছেড়ে দেন। এর মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়ার কাছে একটি বার্তা পাঠান যে আমরা তাদের মত নই। ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন- আল কুদসের জন্য সালাউদ্দিনের মনে যে তীব্র বাসনা ছিল তা যদি কোন পর্বতের উপর রাখা হত, তবে পর্বত সমতল ভূমিতে পরিণত হত।

প্রতিদিন তিনি আল কুদস নিয়ে কথা বলতেন। তিনি প্রতিদিন জেরুজালেম নিয়ে কথা বলতেন। "আমাদের অবস্থার দিকে তাকান! আমাদের কি করুণ অবস্থা! কিভাবে আপনি আল কুদস বিজয়ের কথা বলেন? আমাদের মিশরে সমস্যা আছে, সিরিয়াতে সমস্যা আছে। রাসূল (স) এর দেহ মোবারক প্রায় চুরি করে ফেলা হয়েছিল। হজ্ব বন্ধ করা হয়েছিল এক পথভ্রষ্ট দলের দ্বারা। আপনি কিভাবে জেরুজালেম বিজয়ের কথা বলেন! কিভাবে আমরা আবার জেরুজালেম বিজয় করবো?"
কিন্তু তিনি প্রতিদিন এটা নিয়ে কথা বলতেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাম নিয়ে কথা বলতেন, তিনি আল কুদস নিয়ে কথা বলতেন। মি'রাজের রজনী ছাড়া রাসূল (স) কখনো আল কুদসে প্রবেশ করেন নি। কিন্তু তিনি জেরুজালেমকে ভালবাসতেন। তিনি আল কুদসকে ভালবাসতেন।

১১৮৭ সালের ২০ই সেপ্টেম্বর সালাউদ্দিন (র) তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে জেরুজালেমের সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। তিনি আল হিত্তিন পাহাড়ে তাঁবু গাড়েন। প্রতি রাতে সালাউদ্দিন সেনা ছাউনিগুলো ভ্রমণ করতেন এবং বাতি জ্বালানো আছি কিনা তা পরীক্ষা করতেন। যদি তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য এগুলো জ্বালানো না থাকতো... লোকজন যখন এসে বলত আমরা কি আক্রমণ করবো না? আমরা কি এখনো প্রস্তুত নই? তিনি বলতেন - এখান থেকেই পরাজয়ের শুরু। প্রতি রাতে তিনি সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতেন যে তারা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছে কিনা।

অবশেষে যখন তিনি দেখলেন রাতের বেলা তাঁবুগুলোতে বাতি জ্বলছে, যখন তিনি দেখলেন এমন এক উম্মাহকে যারা গভীর রাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান এবং বিজয়ের জন্য কান্নাকাটি করছে- তিনি বললেন এখান থেকেই বিজয় আসে।

অতঃপর তিনি ২৭শে রজব শুক্রবারে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। এ রাতেই ইসরা এবং মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। এ দিনেই রাসূল (সঃ) মক্কা বিজয় করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করেন।

তিনি প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতন করার পরিবর্তে যেভাবে তারা মুসলমানদের নির্যাতন করেছিল, তিনি তাদেরকে দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের প্রতি ইসলামের সম্মান এবং মর্যাদার গৌরব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করেন সেভাবে যেভাবে উমর (রা) তাঁর ৫০০ বছর পূর্বে একফোঁটা রক্তপাত ব্যতীত প্রবেশ করেন।

কিছু দিন আগে এক কমেন্টেটর মন্তব্য করেন - "যদি ইসরাইলিরা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তবে ইহুদিরা প্যালেস্টাইন থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাদের বিলুপ্তি ঘটবে। আর যদি আরবরা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তাহলে তারা শান্তিতে বসবাস করবে।" কি এক জঘন্য মিথ্যা! কি এক জঘন্য মিথ্যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে! কি এক জঘন্য মিথ্যা এই ধর্মের বিরুদ্ধে! আমরা যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করি আমরা নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরাইনি।

সুবহানাল্লাহ! ঐতিহাসিকরা বলেন- সালাউদ্দিন যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন সেখানকার মহিলারা তাদের মাথা কামিয়ে ফেলে এবং তাদের চেহারা কেটে ফেলে এবং তাদের সন্তানদের লোহিত সাগরে ফেলে দেয়। কারণ তারা ভয়ে ছিল যে তাদের সন্তানদের কি ঘটে। তারা নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে কারণ তারা ভয়ে ছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা না জানি তাদের সাথে কেমন আচরণ করে। কারণ তারা মনে করেছিল - আমরা মুসলিমরা তাদের মত। তারা মনে করেছিল - মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে তেমন আচরণ করবে যেমন ক্রুসেডাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে করেছিল। কিন্তু আমরা তাদের মত নই।

সেদিনের বিজয় শুধু অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারীতের বিজয় ছিল না, এটা শুধু একটা খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় ছিল না - এ বিজয় ছিল জুলুমের উপর ক্ষমার, সীমালঙ্ঘনের উপর সহানুভূতির, অশুভ শক্তির উপর কল্যাণের বিজয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৪১৪

LIFE OF BIN LADEN (may Allah accept him) last part

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

০৩-২৩-২০১৮

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

LIFE OF BIN LADEN–বিশ্ব মৌলবাদী সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক –

বিন লাদেন –জীবনের কিছু স্মৃতি।–শেষ পর্ব।

২০ আগস্টের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তা হলো প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ১২ আগস্ট জানানো হয় যে, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার সাথে বিন লাদেনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ২০ তারিখে এই আঘাত হানার প্রস্তাব দেয়। তারা জানতে পারে যে, ঐ দিন খোস্ত এলাকায় উচ্চপর্যায়ের মুজাহিদ কমান্ডারদের সমাবেশ হওয়ার কথা। উপগ্রহ যোগাযোগ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বিন লাদেন ও অন্যদের মধ্যকার টেলিফোন সংলাপ মনিটর করে তারা এসব জানতে পারে বলে দাবি করা হয়। অবশ্য ১২ আগস্ট প্রেসিডেন্টের কাছে আক্রমণ পরিকল্পনা পেশ করার সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচিত ছিলো গোপন খবরের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা। কারণ ৮ আগস্ট থেকে গোটা আফগানিস্তানের জিহাদী শিবিরগুলোতে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও আনাগোনা ঘটতে থাকে। ১৩ আগস্ট এক মার্কিন কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেন যে, ৭ আগস্টের বোমা হামলার পর থেকে বিন লাদেনের ঘাঁটির লোকজনকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া হতে থাকে। লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ আরবী দৈনিক আল-হায়াহ পাকিস্তানী নিরাপত্তা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, বিন লাদেনের কান্দাহার ও জালালাবাদের সদর দফতরে এবং পাহাড়ী প্রদেশ পাকতিয়ার সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলোতে আরব মুজাহিদদের ঘনঘন আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। এমন সম্ভাবনার কথাও বলা হয় যে, খোস্তে এক বড় ধরনের সম্মেলন হতে পারে এবং বিন লাদেন তাতে উপস্থিত থাকতে পারেন। স্বভাবতই আমেকিানরা এমন একটি সুযোগ হারাতে চায়নি।

বিন লাদেনের ব্লু প্রিন্ট

ওসামা বিন লাদেনের জিহাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংস এবং তাঁকে হত্যা বা বন্দী করার জন্য আফগানিস্তানে চলছে মার্কিন হামলা। কিন্তু সে অভিযান শেষ পর্যন্ত যদি সফল না হয় তাহলে কি হবে?

অনিবার্যভাবে ধরে নেয়া যায় যে, এর ফলে ইসলামী জিহাদীদের পাল্টা আঘাত নেমে আসবে, যার পরিণতিতে বিন লাদেন একজন আঞ্চলিক শক্তির নিয়ন্ত্রায় পরিণত হতে পারেন। সেই মানুষটি তখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার এবং বিশ্বের সিংহভাগ তেল সম্পদ। শোনা যায় বিন লাদেনের আঞ্চলিক আধিপত্যের এটাই হলো নীলনক্সা।

বিন লাদেনের নীলনক্সা বাস্তবায়িত হলে বিশ্বে আফিমের বৃহত্তম উৎস আফাগানিস্তানে ইসলামী শাসন চিরস্থায়ী রূপ নেবে। পাকিস্তানের গোঁড়া রক্ষণশীল জেনারেলরা ক্ষমতা দখল করবে এবং সৌদি রাজপরিবারে ভঙ্গন লেগে দেশটি গৃহযুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হবে। পর্যবেক্ষক ও গোয়েন্দা মহলের ধরণা, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য বিন লাদেন ভালমতোই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। যতই হামলা হচ্ছে ততই বিশ্বের দেশে দেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এই হামলার বিরুদ্ধে ও লাদেনের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে। সৌদি আরবেও জনমত বিন লাদেনের পক্ষে ঝুঁকছে। বিন লাদেন ও তাঁর কর্মকান্ড নিয়ে যথেষ্ঠ গবেষণা করেছেন এমন এক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ টমাস উয়িথিংটনের মতে, আমেরিকা ও ব্রিটেন যতই বিমান হামলা চালাক, বিন লাদেন ঠিকই তার নিজস্ব হিসাব কষে এগিয়ে চলেছেন। তিনি আসলে এই দুটো দেশকে রক্তাক্ত যুদ্ধে টেনে আনতে চান। সেটা সম্ভব হতে পারে যদি দেশ দুটো বিমান আক্রমণ থেকে স্থল আক্রমণের দিকে অগ্রসর হয়। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে বিন লাদেনের। সেই অভিজ্ঞতাকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে লড়াইকে প্রলম্বিত করতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন।

আফগানিস্তানে লড়াই যত প্রলম্বিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক দেশগুলোতে বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভ ততই বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (যখন এটি লেখা হচ্ছিলো সেই সময়কার কথা বলা হচ্ছে)। সর্বত্রই সরকারবিরোধী শক্তিগুলো উত্তরোত্তর অস্ত্র তুলে নেবে। আর ঠিক এটাই চাইছেন বিন লাদেন। কারণ তা হলেই তার সেই

আঞ্চলিক অধিপত্যের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। এদিক দিয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিবেশী পাকিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক বলে অনেকে মনে করেন। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে পেশোয়ারে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। জিহাদপন্থী শক্তিগুলো সেই বিক্ষোভকে তীব্রতম অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইবে এমনই আশা করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে গোঁড়া রক্ষণশীল অংশের মধ্যে জেনারেল মোশাররফের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এরা মোশাররফের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দেখা দেবে। ক'দিন আগে সেনাবাহিনীর দু'জন জেনারেলকে বরখাস্ত করার ঘটনা তারই আলামত। মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ যদি পাকিস্তানকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয় তাহলে তার সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর জিহাদ সমর্থক অংশটির অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসা বিচিত্র কিছু নয়। আর এই অংশটি ক্ষমতায় আসতে পারলে তো বিন লাদেনের জন্য পোয়াবারো। পাকিস্তান তখন হবে তাঁর দ্বিতীয় আবাসভূমি। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বিন লাদেনের সমর্থক কম নেই। সন্দেহ নেই তারা দীর্ঘদিন ধরে বিন লাদেনকে অস্ত্র ও গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে এসেছে। পাকিস্তানের প্রতি বিন লাদেনের দৃষ্টি পড়ার একটা কারণ হতে পারে এর পারমাণবিক অস্ত্র। বিভিন্ন সময় সাক্ষাতকারে লাদেন এই পরমাণু অস্ত্রের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিন লাদেন অন্তত ৩০টি পারমাণবিক বোমার অধিকারী হতে পারবেন, যার প্রতিটির বিধ্বংসী ক্ষমতা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বেমার প্রায় আড়াই গুণ বেশি। ব্যাপারটা তাঁর জন্য কম প্রলুব্ধকর নয়। ইরান আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরোধিতা করলেও দেশটি বিন লাদেনের আঞ্চলিক অধিপত্যের নীলনক্সার অন্তর্ভূক্ত নয়। তার একটা মূল কারণ দেশটি শিয়া মুসলিমপ্রধান, যারা ঐতিহ্যগতভাবে সুন্নী পশতুদের বিরোধী। আর তালেবান সরকারে এই সুন্নী পশতুদেরই একাধিপত্য। তবে সাবেক আফগান যুদ্ধবাজ গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার তেহরানের র‍্যাডিকেল বিরুদ্ধবাদীদের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি লাদেনের জন্য সমর্থন গড়ে তুলতে পারেন। তাহলে সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের আগুন দক্ষিণ ওমান উপসাগরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সৌদি রাজবংশ হবে এর পরবর্তী টার্গেট।

সৌদি সরকার বিন লাদেনবিরোধী মার্কিন হামলা সমর্থন করলেও সৌদি জনগোষ্ঠির মধ্যে বিন লাদেনের সমর্থক কম নেই। কারণ তাদের মতে অন্যরা যা

করতে পারে না বিন লাদেন তা করতে সক্ষম। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তাদের মধ্যে বিন লাদেনের ইমেজ আরও বেড়ে গেছে। সৌদি আরবেও জিহাদপন্থী গ্রুপের অস্তিত্ব আছে এবং তারা সে দেশে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদি সত্যি তা করতে পারে তাহলে এ জাতীয় হামলার প্রতি ওলামা সম্প্রদায়ের প্রচন্ড সমর্থন থাকবে। কারণ তাদের মতে, একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন অমুসলমানের পক্ষ নেয়া ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। সৌদি আরবে বিন লাদেনের সমর্থক ১০ হাজার সাবেক মুজাহিদ রয়েছে, যারা আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। তবে ক্ষমতা দখলের মতো শক্তি তাদের নেই। বিন লাদেনের জন্য এদের চেয়েও বেশি সহায়ক হবে সৌদি রাজপরিবারের ক্ষমতাদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব রাজপরিবারের শত শত শাহজাদাকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করেছে। কোন কোন উপদল বিন লাদেনকে রীতিমতো সমর্থন করে। তাঁকে গোপনে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেয় বলে জানা গেছে।

বিন লাদেন এক সময় আমেকিান লবির লোক ছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সুদূর আফগানিস্তানে গিয়ে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ সংঘটনে অংশ নিয়েছিলেন। সেই বিন লাদেন আমেরিকার ওপর বিগড়ে যান উপসাগর যুদ্ধের সময় সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য মোতায়নকে কেন্দ্র করে। ইসলামের পবিত্র ভূমিতে বিধর্মী সৈন্য উপস্থিতির মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে তাঁর মার্কিনবিরোধিতার প্রতি সৌদি রাজপরিবারের একাংশ, উলামা সম্প্রদায়ের বড় অংশ ও সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমর্থন আছে। বিন লাদেন যদি মার্কিন হামলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে আফগান যুদ্ধকে প্রলম্বিত করাতে পারেন তাহেল ভবিষ্যতে সৌদি শাসকশ্রেণীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ আছে। সেক্ষেত্রে বিন লাদেন অনুগতরা সৌদি সমাজের বিভিন্ন অংশের অসন্তোষকে পুঁজি করে সে দেশে বিদ্রোহ বা গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে সৌদি রাজতন্ত্রকে উৎখাত করলে তো আর কথাই নেই। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে বিন লাদেনের মিত্রদের। আর সম্ভবত সেই সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখেই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেলক্ষেত্রগুলো নিরাপদ রাখার চেষ্টায় সে দেশে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ২০ হাজারে বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

বিন লাদেনের অনুগত সৈন্যের সংখ্যা কত সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে আফগানিস্তানে অবস্থানরত ১৩ টি আরব দেশের যোদ্ধা তার বাহিনীতে আছে। এছাড়া তাঁর আল কায়দা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে বিশ্বের দেশে দেশে। এরা তাঁর ইসলামী বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। ওটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস একদা মুগ্ধতার সঙ্গে পাঠ করেছেন বিন লাদেন। হয়তো সেই সাম্রাজ্যই নতুন আঙ্গিকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

বইটিতে যেভাবে আছে আমি সেভাবেই প্রকাশ করেছি। কোন প্রকার কাটছাট করা হয় নি।

সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী–

এই সম্পূর্ণ লেখাটি আমি আল্লাহর পথে আহবান সাইট থেকে পেয়েছি। এখানে যতটুকু লেখা পেয়েছি ঠিক ততটুকুই শেয়ার করেছি। উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে লেখার ইচ্ছা থাকলেও আমি জানিই কম আর আমার লেখার ধরন খুব ভালো হবেনা বিধায় আর লিখলাম না। উসামা (রহিমাহুল্লাহ)'র সম্পূর্ণ জীবনী যদি আমি কখনও পাই তবে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। পরবর্তী পোস্টে ইনশাআল্লাহ উনার(রহিমাহুল্লাহ) জীবনীর ওপর একটি বই শেয়ার করবো। যদি কোনো ভাই এর কাছে উনার (রহিমাহুল্লাহ) সম্পূর্ণ জীবনী থেকে থাকে তবে শেয়ার করার অনুরোধ রইলো, শেয়ার করবেন কারণ এরকম পুন্যবান মৃত ব্যাক্তিরাই হচ্ছেন অনুসরণীয়, যাদেরকে উম্মাহ চিরদিন মনে রাখবে।
আমার জন্য দুয়া করবেন..... আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

পর্ব ১৬ এর লিংকঃ https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.ph...t-him)-part-১৬

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৩৪৯

এই হল একজন আফগান মায়ের ঈমান!

tarek bin ziad

Senior Member

০৪-১৫-২০১৮

ছোট মুজাহিদ:

গতকাল শহীদ হওয়ার আগে শহীদ হাফেজে কুরআন আব্দুল্লাহ ও তাঁর মায়ের কথোপকথন।

আল্লাহর ক্বসম! চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না।

==========

কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বলছি।

শহীদঃ- "মুর জানে মুরে" আম্মু আমার কথা শুনতে পারছ?

মাঃ- "ওয়া বাছিয়া" বল আব্বু তোমার কথা শুনছি।

শহীদঃ- "মুরে পেহ তামু যিরাহ দাহ" আম্মু আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শোনাতে চাচ্ছি।

মাঃ- "সেহ দি কোর তাহ রাযে?" বাড়ীতে আসবা নাকি?

শহিদঃ- "নাহ মোরে মন হাফেয শুদম মোরে মোরে যেমা দস্তারবন্দী দাহ" আরে না, বরং সুসংবাদ হল আমি হাফেজ হয়ে গেছে আমাকে পাগড়ী দেওয়া হবে। এই খবর শুনে মা এমন খুশী হলেন যেন তিনি সাত রাজার ধন পেয়ে গেছেন। খুশীতে চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছিল, আর সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওয়ায়ে বাচ্ছেয়া! বাছরে মা সাদকে জায়ে?" তাহলে তো তুমি এই বৎসর তারাবীর নামাযে কুরআন খতম করে শুনাবে?

শহীদঃ- "আও কুনাহ মোরে নামা ইনশাআল্লাহ" হ্যাঁ মা এই বৎসর তোমার ছেলে তারাবীর নামাযের জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন শুনাবে ইনশাআল্লাহ।

এই কথা শোনার পর মা খুশীতে আত্মহারা হয়ে ছেলে হাফেজ হওয়ার সংবাদ বাড়ীর সবাইকে শুনালেন এবং বললেন তাঁর বাপ বেঁচে থকলে কতই না খুশী

হতেন (কিছুদিন পূর্বে তার পিতাও আমেরিকান সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর ড্রোন হামলায় ক্ষেতে কাজ করার সময় শহীদ হয়ে যান) এরপর তাঁর মা ট্রাংক খুললেন এবং তিলে তিলে জমিয়ে রাখা টাকার থলেটা বের করে সব টাকা একত্রিত করে তাঁর ভাই তথা শহীদ ছেলের মামাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন, ছেলের জন্য সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী এবং তার উস্তাদগণের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যাও, এবং দস্তারবন্দীর আগে ছেলেকে এই নতুন জামা পরিধান করিয়ে দিবা। ঐ দিন রাতভর মা খুশীর কান্না কাঁদছিলেন আর যখনই ছেলে হাফেজ হয়ে গেছে মনে হত সাথে সাথে হাসি চলে আসত।

হাফেজে কুরআনের মাতা-পিতার সম্মান নিয়ে তাঁর স্বামী থেকে যতগুলো হাদীস শুনেছিল, সব গুলো হাদীস স্বরণ হচ্ছিল।

এই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে আর হাসতে হাসতে রাত কাটালেন,

সকালে স্বামীর কবর যিয়ারত করতে গেলেন, এবং স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমার কাছে অতিসত্বর এমন রাজমুকুট নিয়ে আসব যার আলো সূর্যের আলো থেকেও উত্তম।

অতপর তিনি তাঁর ঘরকে সাজাতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, আমার ছেলে মাথায় পাগড়ি নিয়ে ঘরে আসবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ঐ শহীদের মার কাছে কল আসল তার ভাইয়ের ফোন থেকে, তাঁর ভাই কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, আপু তোমার ছেলে আর নেই? মা বললেনঃ- "সেহ উশু লালা?" তাঁর কি হয়েছে, জবাবে ছেলের মামা বললেন, তোমার ছেলে আর বেঁচে নেই আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে।

এই কথা শুনা মাত্র মা'র পায়ের নিচ থেকে যেন যমিন সরে গেল, আর মাথার উপর থেকে যেন তাঁর আসমানটা কেউ কেড়ে নিল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর সবাই এসে ভীর করে বলল যে, তোমার ছেলের কি হয়েছে?

তখন মা চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার ছেলের দস্তারবন্দী হয়ে গেছে আমার ছেলে কামিয়াব, আমার ছেলেকে জান্নাতে মুল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ দস্তার প্রধান করবেন তাই সে জান্নাতে চলে গেছে।

তাঁরপর ছেলের মামা হাসপাতাল থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরল, তখন ছেলের মা বললেন, ভাই! তুমি আমাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাও যেখান থেকে আমার ছেলের জান্নাতে যাওয়ার সফর শুরু হয়েছে।

তারপর মা সেখানে গিয়ে দেখলেন তার দুলালের গায়ে সাদা নতুন জামাটা ঠিকই আছে তবে জামাটা লালিমা বর্ণের হয়ে গেছে।

এই হল একজন আফগান মায়ের ঈমান!

একটু পরিক্ষা করে নেই যে, এই আফগান মায়ের ঈমানের ষোল আনার এক আনাও আমাদের মাঝে আছে কি না?

আল্লাহ তাঁর নেকবখ্‌ত মা সহ সকল আত্মীয়দেরকে সবরে জামীল দান করুন। এবং এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমানকে তাজা করুন।আমীন।🤲😔

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৫৭৮

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর সংক্ষিপ্ত জিবনী

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

০৩-২৬-২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

আসবাহ আল হারতিয়া।ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহি গ্রাম। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় এই গ্রামের নাম স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ।কারন এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু মহামানবকে।বহু মুজাহিদ আর সমরবিদকে।বহু দার্শনিক আর চিন্তাবিদকে বহু সাহিত্যিক আর ভাষাবিদকে।

১৯৪১ সাল। আসবাহ আল হারতিয়া তখন পরাধীন।ইহুদীদের পদভারে রক্তাক্ত।তার দুরন্ত বায়ুর বুকে সন্তান হারা মায়ের আহাজারি। এতীম শিশুদের আর্তচিৎকার। অসহায় বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের চোখে চোখে অশ্রুর বান। কৌমার্যছিন্ন যুবতী আর তরুণীদের চোখে প্রতিশোধের লেলিহান আগুন। ঠিক তখন আসবাহ আল হারতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এক নবজাত সন্তান।যার নাম আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম। পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত হন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে। মহব্বত করতে শিখেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল্কে;আল্লাহর পথে জিহাদ রত বীরদের কে; সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির আর শাহাদাতের তামান্না শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠতে থাকে।

আব্দুল্লাহ আযযাম এক ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর। সদা গম্ভীর, নিষ্ঠাবান, চিন্তায় ডুবে থাকা এক কিশোর। নিয়মানুবর্তিতা, সময়নুবর্তিতা তাঁর চরিত্রকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অল্প বয়সেই তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে মুসলমানদের মাঝে জাগ্রত করতে পেরেশান হয়ে পরেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর অসাধারন গুণাবলী দেখে শিক্ষকরা হতবাক হয়ে যান। তারা ভাবতে থাকেন,আমাদের এ সন্তান কালের ব্যবধানে

নিশ্চয় বড় কিছু হবে। হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামের সংস্কারের কাজ করিয়ে নেবেন। সুনামের সাথেই তিনি লেখাপড়া করতে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে বেশি সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন।এরপর তিনি এগ্রিকালচারাল কাদরী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন।কিন্তু তার পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা। তাই তিনি পরে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ (ইসলামি আইন)এর উপর বি এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৭ সাল। ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে নিল।রক্তে রঞ্জিত হল পশ্চিমতীর। চোখের সামনে দেখলেন, নির্যাতন আর নিপীড়নের ভয়াল চিত্র। বুক ফাটা আহাজারি, কান্না আর বিলাপের অসহনীয় বেদনা তার হৃদয়কে করে ক্ষত বিক্ষত। তার চোখে জমাট বাধে অশ্রু। তিনি শপথ করলেন, না, আর নয়। ইহুদীদের দখলদারিত্বের অধিনে তিনি আর থাকবেন না। তার পেশীতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে।চির চেনা শান্ত সমাহিত সেই আযযাম যেন জ্বলন্ত আঙ্গার। তবে অত্যন্ত নিরব এবং ধীর স্থির। দারুন চিন্তাশীল। সময়ের ব্যবধানে হলেও তিনি সফলতার মুখ দেখতে চান।অত্যাচারীর হাত চিরতরে গুরিয়ে দিতে চান।

১৯৭০ সাল। তিনি তখন জর্দানে। ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দিলেন। শুরু হল তার জীবনের আরেক অধ্যায়। চিন্তায় লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন তাকে আরও পড়তে হবে। তাকে শিখতে হবে। ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অল্প বিদ্যা নিয়ে সামনে চলা বড়ই কঠিন এবং অত্যন্ত দুষ্কর। তাই তিনি চলে এলেন মিসরে। ভর্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করলেন। ১৯৭১ সালে আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বছরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসুলুল ফিকহ) এর উপর পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ.'র (১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোজ খবর নিতে যান।

শহীদ শেইখ আব্দুল্লাহ আযযাম দেড় বছর ফিলিস্থিনের জিহাদে অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ সময় তিনি মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলেন না। কারন তিনি দেখতেন, যারা ফিলিস্তিনের জিহাদে রত তাদের অনেকেই ইসলাম থেকে দূরে সরে আছে। মাঝে মধ্যেই তিনি দুঃখ করে বলতেন, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য এটা কোন ধরনের জিহাদ হচ্ছে, যেখানে মুজাহিদ ভাইয়েরা প্লেইং কার্ড, গান শোনা আর টেলিভিশনের অশ্লিল ছবি দেখে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে! তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেন,হাজারো মানুষের জনবহুল জায়গায় সালাতের জন্যে আহবান করা হলে একেবারেই অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় যাদের হাতের আঙ্গুলী দিয়ে গোনা সম্ভব, এদের দিয়ে কী জিহাদ হবে! তাই তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা তাকে প্রতিহত করত।বাধা দিত। একদিন তিনি এক মুজাহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের এই যুদ্ধের সাথে কি দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে? তখন সেই মুজাহিদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, এই যুদ্ধের সাথে দ্বীন ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।

এ কথা শোনার পর ড. শেখ আব্দুল্লাহ আযযামের মন ভেঙ্গে যায়। তিনি ফিলিস্থিনের রনাঙ্গন তখনই ত্যাগ করেন। এবং ফিলিস্থিন ত্যাগ করে তিনি তখন সৌদি আরবে চলে আসেন। জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের নির্মল দেতনা ও জিহাদী জযবা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেখানে পাঠদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করেন,যে মুসলিম উম্মাহর বজয় ফিরিয়ে আনতে পারে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী। এ ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়। তখন থেকে জিহাদ আর বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ আর বিনোদন সঙ্গি। তিনি অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে থাকেন,আর কোন সমঝোতা নয়, আর নয় আলাপ আলোচনা। জিহাদ আর রাইফেলই হবে সমাধানের একমাত্র পথ। মসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার একমাত্র রাস্তা।

১৯৮০ সাল। হজ্জে এসেছেন এক আফগান মুজাহিদ। সহসা তার সাথে দেখা হয়ে যায় শেইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.'র।কথার তালে তালে সখ্যতা বৃদ্ধি পেল। তার কাছ থেকে একের পর এক শুনলেন আফগান জিহাদের অবিশ্যাস্য কাহিনী। মুজাহিদদের ত্যাগ, কুরবানী আর আল্লাহর মদদের কাহিনী শুনতে শুনতে শেইখ

আব্দুল্লাহ আযযাম অভিভূত হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এতোদিন ধরে তিনি এ পথটিই খুজে ফিরছিলেন।এরই খোজ করছিলেন তিনি।এরপর থেকেই তার মন অস্থির হয়ে ওঠে।অশান্ত হয়ে ওঠে।তিনি বাদশা আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে আসেন। শুরুতে তিনি ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আফগান মুজাহিদ নেতার সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। তখন আফগান জিহাদ সম্পর্কে তিনি বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেন। নানা বিষয়ে খোজ খবর নেন। চলমান জিহাদের রূপরেখা অনুধাবন করেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন।হৃদয়-মন,মেধা-যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু অকাতরে উজাড় করে দান করেন আল্লাহর রাস্তায়। সেই সুয় শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের কণ্ঠ চিরে বার বার রাসুলের এই বাণীটি মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত, "আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বছর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে উত্তম।" তারপর তা তাদের হৃদয়ে ছুয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শাহাদাতের আশায় তাদের অস্থির করে ছাড়ত। তারা ব্যকুল হয়ে যেত জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে উড়ে বেরানোর জন্যে।

আব্দুল্লাহ আযযাম ও তার প্রিয় শিষ্য উসামা বিন লাদেন পেশোয়ারে অবস্থানকালে মুজাহিদদের সেবা সংস্থা বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এ সংস্থা আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত। নতুন মুজাহিদদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্থানে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ করত। ইতোমধ্যে তিনি তার পরিবারকেও নিয়ে আসেন।

এরপর আব্দুল্লাহ আযযাম আরো সামনে আগ্রসর হলেন। জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। হাতে তুলে নিলের অস্ত্র।ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন সম্মুখ লড়াইয়ে। অসম্ভব সাহসিকতায় বীরের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন।আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। ছুটে চললেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রনক্ষেত্র থেকে আরেক রনক্ষেত্রে। আহ! এ যেন আরেক জীবন।এ জীবনের কোন মৃত্যু নেই। এর স্বাদ, রঙ, রূপ আর প্রক্রিতি একেবারেই আলাদা। তিনি আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে ছুটে গেলেন। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জশির উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে ছুটে চললেন বিরামহীন গতিতে। ফলে আফগান রনাঙ্গনের সাধারণ

যোদ্ধা ও মুজাহিদদের সাথে তার পরিচয় হয়। সখ্যতা গড়ে ওঠে। বন্ধুত্ব হয়। সবাই তাকে তার হৃদয়ের উদারতা, জিহাদি জযবা,আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার আকুতি মুসলিম উম্মাহর দরদী ব্যক্তিত্বের কারনে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে থাকে।মহব্বত করতে থাকে।

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন পেশোয়ারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এবার পরিপূর্ণ। গোটা আফগান রনাঙ্গনের সমস্যা-সমাধান তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। জিহাদের এই কাফেলাকে সঠিক পথে পরিচালনার ও চুড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার তামান্নায় তিনি অস্থির। তাই মুজাহিদদের মাঝে সংস্কারমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মুজাহিদদের পরিশুদ্ধ করতে লাগলেন। জিহাদের পথে নানা বিভ্রান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। বিভক্ত মুজাহিদদের গ্রুপ গুলোকে একই কাতারে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন । কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলেন। যারা কখনো জিহাদের কাতারে শাম্মিল হয়নি; সম্মুখ লড়াইইয়ে অংশ নেয়নি তাদের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উদ্ভুদ্ধ করতে লাগলেন। আফগান মুজাহিদ নেতার মাঝে তার প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই সবাই তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তার প্রস্তাব, পরিকল্পনাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের ব্যপারে জাগ্রত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। আফগান জিহাদের পবিত্র আহবানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছুটে যান বিশ্বের বহু দেশে।সাক্ষাৎ করেন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে থাকেন। চারদিকে ছুটতে থাকে অনল প্রবাহ। তিনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য, শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের লুণ্ঠিত ভূমিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ফাকে ফাকে তার কলমও ছুটতে থাকে।তিনি জিহাদের বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। যা এখনও পাঠককে আন্দোলিত করে। আলোড়িত করে।জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পুস্তকগুলোর শীর্ষে রয়েছে- এসো কাফেলাবদ্ধ হই, আফগান জিহাদে রহমানের নিদর্শন সমূহ, মুসলিম ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা, রারা জান্নাতের কুমারীদের ভালোবাসে ইত্যাদি।

শহীদ শেইখ আব্দুল্লহা আযযামের আবিরাম প্রচেষ্টা, মেহনত-মুজাহাদা সফলতার আলো দেখতে পায়। তিনি বিশ্বের মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদের ব্যপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন । এর ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা অন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে ছুটে আসতে থাকে। তারা ইহুদী-খ্রিস্টান্দের হাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের উদ্ধারে শপথ গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রত্যেক লড়াইয়ে অংগ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

তিনি তার মানসপটে একটি চিত্রই একেছিলেন। আর তা হল, জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি খিলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতে এবং বার বার বলতেন, পৃথিবীর বুকে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাবকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন আর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি ততক্ষন পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষন পর্যন্ত হয় তিনি বিজয়ী হবেন নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

আফগান রণাঙ্গন ছিল তার স্বপ্নের চারণভূমি। তাই তিনি বলতেন আমি কখনো জিহাদের ভূমি পরিত্যাগ করব না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব, নতুবা হাত বাধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিস্কার করা হবে।

একদিন মিম্বারে খুতবা দানকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি মনে করি আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বছর। সাড়ে সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে। এছাড়া আমার জীবনের বাকি সময়গুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।

তিনি আরো বললেন, জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক আল্লাহর ইবাদত করাহবে। এ জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের সম্মান ও লুণ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ হল চিরস্থায়ি মর্যাদার পথ। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে জুমআর খুতবায় বলতেন,

মুসলিম জাতি কখনো অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত হয়নি। আমরা মুসলমানরা কখনো আমাদের শত্রুর কাছে পরাজিত হই নি; বরং আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই পরাজিত হয়েছি।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মানুরাগ,আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, সংযমশীলতা ছিল তার চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনো কারো সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না। তরুণদের তিনি ভিন্ন চোখে দেখতেন। তাদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। সবধরনের ভয়-ভীতি মারিয়ে হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে দাউদ আ.'এর সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করতে একদিন বিরত থাকতেন। এভাবে তিনি সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং অন্যদেরও এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে উতসাহিত করতেন । একদা এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম কাফের হয়ে গেছে, কারন তিনি মুসলমানদের সম্পদ অপচয় করছেন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না।ক্ষিপ্তও হলেন না। তাদের সাথে কোন রুঢ় আচরণও করলেন না; বরং তাদের জন্য কিছু উপহার সমগ্রি পাঠিয়ে দিলেন। এরপরও কিছু লোক বিরত হল না। তারা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে লাগল।অপবাদ ছড়াতে লাগল। শাইখ আযযাম র. তখনও কিছু বললেন না। বরং নিয়মিত তাদের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তারপর একসময় তাদের ভুল ভাঙল। তখন তারা বলতে লাগল,আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের মত মানুষ দেখিনি। তিনি আমাদের নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেত অথচ আমরা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতাম। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টার ফলে আফগানিস্থানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হল। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্রুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে লাগল।এ অবস্থায় শত্রুরা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুজতে লাগল।

পেশোয়ারে তিনি এক মসজিদে নিয়মিত জুমার নামায পড়াতেন। নামাযের আগে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতেন। দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসত। ১৯৮৯ সালে শত্রুরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার মিম্বারের নিচে একটি শক্তিশালি টিএনটি বিস্ফোরক রেখে দিল। এটা এতোই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মসজিদটি ধ্বসে পরত।মসজিদের কেউ জীবিত থাকত না। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তাই সেই বিস্ফোরকটি আল্লাহর হুকুমে আর বিস্ফোরিত হয়নি।

এ দিকে শত্রুরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলো । ১৯৮৯ সালের ২৪ শে নভেম্বর। শুক্রবার। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে শত্রুরা তিনটি বোমা পুতে রাখল।রাস্তাটি ছিল সরু।একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে বন্ধ হয়ে গেল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তার দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। আর তাদের সাথে ছিলেন তার বন্ধু তামিম আল আদনানির এক পুত্র। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্রুদের পুতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেপে উঠল পুরো শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পরল সর্বত্র। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষরা দৌড়ে এল। তারা ছুটে এসে গাড়ির বিক্ষিপ্ত টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেলনা। বিস্ফোরনের ফলে শাইখের দুই ছেলের দেহ ১০০ মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। তাদের দেহ বিভিন্ন গাছের ডালে বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল।কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের দেহকে রক্ষা করলেন।দেহটি সম্পূরণ অক্ষত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তার মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

তার শাহাদাতের সংবাদে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। মুজাহিদদের শিবিরে শিবিরে সে কান্না ছড়িয়ে পরল।স্তব্ধ হয়ে গেল তার নিকট তম ব্যক্তিরা। এই ভাবে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন তিনি । আল্লাহ তার এই ত্যাগকে কবুল করুক।আমিন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সম্পর্কে কতিপয় মন্তব্যঃ

১.শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাহ। একটি জাতি। তার শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তার মতো দ্বিতীয় আরেক সন্তান জন্ম দিতে পারে নি।

[১৯৯৯ সালে আল জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলে শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাতকার প্রচারিত হয়। শাইখ উসামা সেই সাক্ষাৎকারে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.সম্পর্কে উপরের উক্তিটি করেন]

২. বিংশ শতাব্দিতে জিহাদকে পুনঃ জাগরণে তিনিই (শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম র.) দায়ী।[টাইম ম্যাগাজিন]

৩. ১৯৮০ এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম ছিলেন এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে।তিনি (আব্দুল্লাহ আযযাম) মুজাহিদীনদের ব্যপারে বলতেন, যে কেউ জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল শহীদী কাফেলার সাথে। [চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার ইবনুল খাত্তাব রহ.]

৪. তার কথা সাধারণ মানুষের মত ছিল না, তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন কিন্তু তার কথার গভীরতা ছিল অসীম। যখন আপনি তার দিকে তাকাবেন,আপনার হৃদয় ইমানে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ন হয়ে যাবে। [মক্কার জনৈক মুজাহিদ শাইখ]

সম্পাদনা : আবু সাঈদ মুহাম্মাদ উমর

“মুসলিমদের কেউ পরাজিত করতে পারে না, আমরা পরাজিত হই আমাদের শত্রুদের কারণে নয়, বরং নিজেদের কারণে”- আব্দুল্লাহ আযযাম

আরও পড়ুন, আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ রচিত বিখ্যাত তাফসীর, তাফসীরে সূরা তাওবা

ডাউনলোডঃ http://www.pdf-archive.com/২০১৪/০৩/১...dpress-com.pdf

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৩৮৩

LIFE OF BIN LADEN (may Allah accept him) part 1-7

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

০২-২৩-২০১৮

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

উসামা রহিমাহুল্লাহ এর জীবনের ওপর কিছু লেখা একটি ওয়েবসাইট এ পেলাম। আমি এটা পড়লাম এবং আমার মনে হলো সবার এ যমানার মহাপুরুষ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় শাইখের জীবনী সবার জানা প্রয়োজন। তাই এই লেখাগুলো শেয়ার করলাম।

LIFE OF BIN LADEN–বিশ্ব মৌলবাদী সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক –বিন লাদেন –জীবনের কিছু স্মৃতি পর্ব ১-৭

LIFE OF BIN LADEN–বিশ্ব মৌলবাদী সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক –বিন লাদেন –জীবনের কিছু স্মৃতি।

আমার সকল বন্ধুদের দোয়া নিয়ে শুরু করলাম। আপনারা বেশী বেশী শেয়ার-কপি-পেষ্ট করে ছড়িয়ে দিন সকলের কাছে। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন। আমিন

পূর্বকথা———

উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, মহান সংস্কারক। উম্মাহর দুর্দিনের দরদী নেতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব দুনিয়া বিমুখতার প্রতীক। লক্ষ কোটি মুসলমানের ভালোবাসার স্বর্ণমুকুট তাঁর মাথায়। মজবুত এক অদৃশ্য বন্ধনে তিনি জুড়ে আছেন প্রতিটি মুমিন হৃদয়ের সাথে। তাঁর ভালোবাসা একদিন অজ

পাড়াগাঁ'য়ের মানুষকেও রাস্তায় বের করে এনেছিল। উসামার পক্ষে সে দিন তাদের বজ্রকণ্ঠ বেজে উঠেছিল। বড়দের সেই ভালোবাসা সেদিন আমাদের ছোটদের হৃদয়ও স্পর্শ করেছিল। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে। সেই কণ্ঠ এখনও আমার কানে বাজে।

কিন্তু কালের কৌশলী অবিচার বহু মানুষের হৃদয়ের লালিত সেই ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছে, মিডিয়ার অপপ্রচার বহু সংশয়ের জন্ম দিয়েছে তাদের মনে; ওসামার আঁচল যার দূষণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ওসামার প্রতি অকৃত্তিম ভালোবাসার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের এক ভাই। (হাফিযাহুল্লাহ) দীর্ঘ এক যুগ তার কেটেছে জেলখানায়। আফগানিস্তানে যখন আমেরিকার আগ্রাসন শুরু হয় তখন তিনি জেলে। বিন লাদেন তখন মিডিয়ার সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। আমাদের দেশের বিখ্যাত একটি জাতীয় দৈনিকে শায়খকে নিয়ে এক মার্কিন গবেষকের প্রকাশিত লেখার অনুবাদ ও বিভিন্ন বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ছাপা হয় ধারাবাহিকভাবে। এতে উঠে এসেছে শায়খের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক, যা কাফেরদের দৃষ্টিতে খারাপ হলেও একজন প্রকৃত মুমিনের গুণ। যেগুলো থেকে নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে এটাই স্পষ্ট হবে যে, এমন মহৎ গুণাবলীর অধিকারী একজন মানুষ কখনই 'সন্ত্রাসী' হতে পারেন না। নিশ্চিত এটা দুশমনদের অপবাদ ও অপকৌশল মাত্র। আর এখানেই আমাদের শ্রমের স্বার্থকতা। লেখাগুলো তিনি পত্রিকার পাতা থেকে কেটে রাখেন। জেল থেকে বের হওয়ার সময় সেগুলো নিয়ে আসতে ভুলে যাননি। পরে তা পরম যত্নে রেখে দিয়েছেন। ঐ লেখাগুলো নিয়েই আমাদের এই আয়োজন, সেই অবিচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রয়াস।

লেখক শত্রুপক্ষের হলেও অনেক বাস্তব বিষয় তিনি এড়িয়ে যাননি। (তবে তার দেয়া আইএসআই সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক) যাতে রয়েছে ভালোবাসার খোরাক, পত্র-পত্রিকার উড়াল খবরে আস্থাশীলদের সংশয়ের নিরসন। সাহস ও আত্মবিশ্বাসের গল্প। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা। আরো রয়েছে ...

লেখকের শব্দের বুলেটগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন আমরা করিনি। এসব পরিবর্তনের আরো একটি কারণ

হলো, যেন এগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে; এগুলোর ভীতি বিদূরীত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস আসলে যুদ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস। নদীর এ কূল ভেঙ্গে ও কূল গড়ার মত এক জাতি ও সভ্যতার জয় ও অপরটির পরাজয়ের চিত্রই তাতে দেখা যায়। নিজেকে একজন শান্তিকামী ভাবা, যুদ্ধ-জিহাদ থেকে নিজেকে পৃথক মনে করার অর্থ হলো, নিজের আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া, পৃথিবীর মূল স্রোত থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখা।

যে চেতনা বিন লাদেনকে রাজপ্রাসাদ থেকে পাহাড়ের গুহায় এনেছিল মুসলিম উম্মাহ সেই চেতনায় উজ্জিবীত হবে, ইসলামী খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হবে সেদিন বেশি দূরে নয়। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও তাওফিকদাতা।

মেহেরবান আল্লাহ শায়খের মর্যাদা আরো অনেক বাড়িয়ে দিন। আমীন।

অনুবাদকের কথা

আফগানিস্তানে আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরাশক্তি আমেরিকা। ক্ষেপণাস্ত্র আর বোমার মুহুর্মুহু আঘাতে কেঁপে উঠছে আফগনিস্তানের মাটি। ধ্বংস হচ্ছে নগর, গ্রাম, জনপদ। অকাতরে মরছে নিরীহ মানুষ। দেশটি পরিণত হয়েছে এক বিশাল রক্তাক্ত প্রান্তরে। আমেরিকার এই হামলার লক্ষ্য বাহ্যত একটাই বিশ্ব জিহাদের প্রাণপুরুষ ওসামা বিন লাদেনকে বন্দী কিংবা হত্যা করা। কিন্তু বিন লাদেন যেন প্রহেলিকা তাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আফগানিস্তানের কোন নিভৃত গুহায় বসে জিহাদ আন্দোলনের জাল বুনে চলেছেন লাদেন কেউ জানে না। এক সৌদি ধনকুবেরের পুত্র কিভাবে বিশ্ব জিহাদের নেতৃত্বে আসলেন? আফগানিস্তান বিশেষজ্ঞ জেসন বার্ক এখানে বিন লাদেনের সেই বিস্ময়কর উত্থানের বিবরণ দিয়েছেন।

বিন লাদেনের বিস্ময়কর উত্থানের নেপথ্যে

রাতের আঁধারে ঢাকা একটি গ্রাম। সে গ্রামের আনাচে কানাচে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে রক্ষীরা। কালাসনিকভ ও রকেট লাঞ্চার হাতে সদাপ্রস্তুত । সে গ্রামের মাটি, ইট ও কাঠের তৈরি একটি বাড়ির ভিতর ধূলিময় মেঝেতে চাদর বিছিয়ে বসে আহার করলেন দু'জন লোক। ভাত, ঝলসানো মাংস আর নিরামিষ।

মাথার অনেক ওপরে অন্ধকার রাতের আকাশ চিরে ছুটে চলা আমেরিকার যুদ্ধ বিমানগুলোর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। লোক দু'টোর উভয়ের বয়স মধ্য চল্লিশের কোঠায়। শ্মশ্রুমন্ডিত। পরনে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ঢিলেঢালা পোশাক লম্বা জামা ও সালোয়ার। খাওয়া সেরে তারা হাত মুখ ধুলেন। নামাজ পড়লেন। তারপর বসলেন আলোচনায়। এদের একজন বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' বলে পরিচিত ওসামা বিন লাদেন এবং অন্যজন তালেবান সরকারের প্রধান মোল্লা ওমর। তাঁদের আলোচনা করার মতো অনেক কিছুই ছিলো। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে জিহাদী হামলার প্রতিশোধস্বরূপ কিছুদিন আগে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ন'টায় মার্কিন ও ব্রিটিশ ক্রুজ মিসাইল আফগানিস্তানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। ফলে আফগানিস্তানজুড়ে শহর-নগর-গ্রাম-সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছে। বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর যে গ্রামে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন তার অনতিদূরে বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র এসে পড়েছিল।

আরও কয়েকটি আঘাত হেনেছিলো তালেবানদের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক ঘাঁটি দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী কান্দাহারে। তারা দু'জন সেখানে মিলিত হয়েছিলেন একটা সিদ্ধান্তের জন্য। হঠাৎ করেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে এখন তাদের করণীয় কী হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল বৈঠকের উদ্দেশ্য। উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে ব্রিটেনের 'দ্য অবজার্ভার' পত্রিকার প্রতিনিধি জানতে পারেন যে বৈঠক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। না হবার অংশত কারণ ছিল নিরাপত্তার ভাবনা। একটা টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁত নিশানায় নিক্ষিপ্ত হলে পেন্টাগনের মূল টার্গেট এই দুই ব্যক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারত। বৈঠকে প্রায় সকল- বিষয়েই এ দু'জনের ঐকমত্য হয়েছিল। বৈঠক তাড়াতাড়ি শেষ হবার এটাও ছিল অংশত কারণ। মোল্লা ওমর তাঁর সৌদি বংশোদ্ভুত বন্ধুর প্রতি সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। বিন লাদেনের জবাবও ছিল অনুরূপ। কৌশলগত প্রশ্নে তাঁরা দু'জনে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ঠিক হলো যে, তাঁরা যৌথভাবে যে কোন আগ্রাসন প্রতিহত করবেন। তারা তাদের বিরুদ্ধে গঠিত কোয়ালিশনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কাজ করবেন এবং সেই বিভেদের সদ্ব্যবহার করবেন এবং তারা বোমা হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও প্রতিবাদের জোয়ার সৃষ্টির জন্য মানবিক সঙ্কটকে, বিশেষ করে নিরীহ অসামরিক জনগোষ্ঠীর হতাহতের ঘটনাগুলো কাজে লাগাবেন। বৈঠক শেষে তারা পরস্পর কোলাকুলি

করে যে যার পথে প্রস্থান করেন। তারপর থেকে তাদের মধ্যে আর বৈঠক হয়নি বলে ধারণা করা হয়। যে মানুষটিকে জীবিত ধরার অথবা হত্যা করার জন্য আজ আমেরিকা তার প্রায় গোটা সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই ওসামা বিন লাদেনের জীবনচিত্র পেতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৩০ সালে ইয়েমেনের দারিদ্র্যপীড়িত প্রদেশ হাদ্রামাউতে। সেখানে একজন ডক শ্রমিককে চোখে পড়বে। ছ'ফুট লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন তবে এক চোখ অন্ধ এই মানুষটি একদিন অনেক ভেবে ঠিক করলেন যে, বন্দরে বন্দরে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের কাজ ছাড়াও জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে।

যেই ভাবা সেই কাজ। লোকটি একটা ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড় ও টুকিটাকি জিনিস নিয়ে উটের কাফেলায় করে রওনা দিলেন সদ্য গঠিত রাষ্ট্র সৌদি আরবের উদ্দেশে। এভাবে ভাগ্যান্বেষণে শুরু হলো তার সহস্র মাইলের পথপরিক্রমা। এই মানুষটিই ওসামা বিন লাদেনের বাবা মোহাম্মাদ বিন লাদেন। মোহাম্মাদ বিন লাদেন সৌদি আরবের মাটিতে পৌঁছে প্রথম যে কাজটি পেলেন সেটা আরব আমেরিকান তেল কোম্পানি আরামকোর 'রাজমিস্ত্রি'র কাজ। দিনে মজুরি পেতেন এক রিয়াল, যার তখনকার মূল্য ছিল ১০ পেন্সের সমান। জীবন যাপনে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। কঠোর কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করতেন। সেই সঞ্চয় সার্থকভাবে বিনিয়োগ করতেন। এভাবেই এক সময় তিনি ব্যবসায় নেমে পড়েন। ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে মোহাম্মদ লাদেনকে রিয়াদে সৌদি রাজপরিবারের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় ফার্মগুলোকে সুকৌশলে ঘায়েল করে তিনি এই নির্মাণ ঠিকাদারী লাভ করেছিলেন। ওটা ছিল এক ধরনের জুয়াখেলার মতো, যেখানে তার জিত হয়েছিলো। মদীনা জেদ্দা মহাসড়ক নির্মাণের চুক্তি থেকে এক বিদেশী ঠিকাদার সরে গেলে মোহাম্মদ লাদেনের জন্য এক বিরাট সুযোগ এসে ধরা দেয়। এই সুযোগ তার বড় ধরনের সাফল্যের সোপান রচনা করে। তিনি ঐ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান এবং একজন ব্যতিক্রম ধরনের ধনী। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না এবং সারা জীবন টিপসই দিয়ে কাজ করেছেন। তবে তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল । ষাটের দশকে তার সঙ্গে কাজ করেছেন এমন একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে এ তথ্যটি জানা যায়। শ্রমিক থেকে ধনী হলেও মোহাম্মদ লাদেন তার শিকড় কোথায় তা কখনই ভুলে যাননি। গরিবদের দেয়ার

জন্য তিনি সর্বদাই এক তোড়া নোট বাড়িতে রেখে যেতেন। এ ধরনের দান খয়রাত ইসলামের শিক্ষা। মোহাম্মদ লাদেন ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সুন্নী ইসলামের কঠোর ও রক্ষণশীল ওয়াহাবী ভাবধারায় লালিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গর্ব করে বলতেন যে, নিজের হেলিকপ্টার কাজে লাগিয়ে তিনি একদিনে ইসলামের তিন পবিত্রতম স্থানে যথা মক্কা, মদীনা এবং জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারেন। মক্কা ও মদীনায় যাওয়া তার জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ পরিতৃপ্তির কারণ ছিলো। কারণ হজ পালন ও রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনায় আগত লোকদের জন্য বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সম্প্রাসারণ কাজের মধ্য দিয়ে তার কোম্পানির সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্টতার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস নিশ্চিত হয় এবং সেই সঙ্গে তিনি অমিত ধনসম্পদের অধিকরী হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে তিনি এতই ধনী ছিলেন যে, দুঃসময়ে সৌদি রাজ পরিবারকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তিনি তাদের সঙ্কট ত্রাণে সহয়তা করতেন। তথাপি যে জীর্ণ, পুরানো ব্যাগটি নিয়ে তিনি একদিন ইয়েমেন থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন সেটি তার প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রদর্শনীর জন্য রক্ষিত ছিল।

শোনা যায়, বড়লোকরা যেভাবে গাড়ি বদলায়, পুরনোটি বাদ দিয়ে নতুনটি কিনে আনে, মোহাম্মাদ লাদেনও সেভাবে বউ বদলাতেন। তার তিন সৌদি স্ত্রী ছিল এবং তারা মোটামুটিভাবে ছিলো স্থায়ী। তবে চতুর্থ স্ত্রীটি নিয়মিত বদলানো হতো। ধনকুবেরের লোকেরা মধ্যপ্রাচ্যের তল্লাট ঘুরে তার পছন্দের কনে যোগাড় করে আনত। কারও কারও বয়স ছিলো পনেরো বছর। তাদের আপদামস্তক বোরখায় ঢাকা থাকত। তবে সবাই ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী।

ছেলেবেলা

বিন লাদেনের মায়ের নাম হামিদা। তিনি সৌদিয়ানও নন, ওয়াহাবীও নন। তিনি এক সিরীয় বণিকের কন্যা। অসামান্য সুন্দরী হামিদা ছিলেন অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির। বিদুষীও ছিলেন তিনি। ২২ বছর বয়সে মোহাম্মদ লাদেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ লাদেনের দশম বা একাদশ স্ত্রী। তার মানে এই নয় যে, এক সঙ্গে দশ বারোটা বউ রাখতেন মোহাম্মদ লাদেন। তিনি অনেক স্ত্রীকেই তালাক দিয়েছিলেন। তবে তালাক দিলেও জেদ্দা বা হেজাজে তাঁদের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দশম বা একাদশ স্ত্রী হামিদার গর্ভে মোহাম্মদ

লাদেনের সপ্তম পুত্র ওসামা বিন লাদেনের জন্ম ১৯৫৭ সালে। পিতার বিপুল বিত্ত ও বৈভবের পরিবেশে বিন লাদেন বড় হয়ে উঠতে থাকেন।

ওসামা ১১ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। বাবার সান্নিধ্য কখনই খুব বেশি একটা লাভ করেননি তিনি। ১৯৯৮ সালে বিন লাদেনের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে আমেরিকার এবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক লাদেন পরিবারের ওপর একটি দলিল হস্তগত করে। তা থেকে লাদেনের ছেলেবেলার অনেক কথা জানা গেছে। তাঁর বাবা ছিলেন অতিমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ। নিজের সব সন্তানকে তিনি এক জায়গায় রাখতে চাইতেন। তাঁর শৃঙ্খলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। সন্তানদের সবাইকে কঠোরভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হত। একই সঙ্গে আমোদ প্রমোদও পছন্দ করতেন তিনি। সন্তানদের নিয়ে তিনি সমুদ্র ভ্রমণে যেতেন। মরুভূমি পাড়ি দিতে যেতেন।

ছেলে মেয়েদের তিনি বড়দের মতো জ্ঞান করে সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন। তিনি চাইতেন কচি বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা আত্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিক। কৈশোরে বিন লাদেনকে জেদ্দায় 'আল আগ' নামে এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিলো। পাশ্চাত্য স্টাইলের এক অভিজাত সৌদি স্কুল। ১৯৬৮-৬৯ সালে বিন লাদেন যখন এ স্কুলে পড়তেন তখন সেখানে ব্রায়ান কাইফিল্ড শাইলার (৬৯) নামে একজন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি সে সময় লাদেনসহ ত্রিশজন বিত্তবান পরিবারের ছেলেকে সপ্তাহে চারদিন এক ঘণ্টা করে ইংরেজী পড়াতেন। ব্রায়ান শাইলার বিন লাদেনকে ভদ্র ও বিনয়ী হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, ছেলেটা বেশ লাজুক ছিল। নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করত। শাইলারের ভাষায়ঃ 'ক্লাসের যে কোন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি বিনয়ী ও ভদ্র ছিল বিন লাদেন। শারীরিক দিক দিয়েও সে ছিল অসাধারণ। অধিকাংশ ছেলের চেয়ে সে ছিল লম্বা, সুদর্শন ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী। শুধু ভদ্র ও বিনয়ী নয়, তাঁর ভিতরে প্রবল আত্মবিশ্বাসও ছিলো। কাজকর্মে অতি সুচারু, নিখুঁত ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলা। নিজেকে মোটেই প্রকাশ করতে চাইত না সে। বেশিরভাগ ছেলে নিজেদের বড় বুদ্ধিমান বলে ভাব দেখাত। বিন লাদেন তাদের মতো ছিল না। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে সে নিজ থেকে বলত না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলেই শুধু বলত।' বিন লাদেন যে একজন কঠোর ধর্মানুরাগী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন কৈশোরের প্রথমদিকে তেমন কোন লক্ষণ ধরা পড়েনি। ১৯৭১ সালে মোহাম্মদ লাদেনের

পরিবার সদলবলে সুইডেনের তাম্র খনিসমৃদ্ধ ছোট শহর ফালুনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। সে সময় একটা ক্যাডিলাক গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো হাল্কা সবুজ টপ ও নীল রঙের ফ্লেয়ার পরা হাস্যোজ্জ্বল ওসামার একটা ছবি তোলা আছে। ওসামা সে সময় কখনও নিজেকে "স্যামি" বলে উল্লেখ করতেন। ওসামার বয়স তখন ১৪ বছর। এর এক বছর আগে ওসামা ও তাঁর অগ্রজ সালেম প্রথমবারের মতো ফালুনে গিয়েছিলেন। সৌদি আরব থেকে বিমানযোগে কোপেনহেগেনে আনা একটা রোলস্রয়েস গাড়ি চালিয়ে তাঁরা ফালুনে গিয়ে পৌঁছেন। আশ্চর্যের কথা হলো, তাঁরা এস্টোরিয়া নামে একটা সস্তা হোটেলে ছিলেন। হোটেলের মালিক ক্রিস্টিনা আকের ব্রাদ নামে এক মহিলা সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন যে, ওরা দিনের বেলা বাইরে কাজকর্ম করে বেড়াত আর সন্ধার পর নিজেদের রুমে খাওয়া দাওয়া করে কাটাত। মহিলা বলেন, 'আমার মনে আছে ওদের কথা। সুন্দর দুটো ছেলে। ফালুনের মেয়েরা ওদের খুব পছন্দ করত। ওসামা আমার দুই ছোট ছেলের সঙ্গে খেলত।' হোটেলের মালিক সেই মহিলা ছেলে দুটোর রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের যে সম্পদের পরিচয় পেয়েছিলেন সে কথাও স্মরণ করেছেন তিনি। বলেছেনঃ 'উইকএন্ডগুলোতে আমরা দেখতাম ওরা ওদের রুমে একটা বাড়তি বিছানায় কাপড় চোপড় বিছিয়ে রাখত। সেলোফিনে প্যাকেট করে রাখা অসংখ্য সাদা সিল্কের শার্ট ছিলো ওদের। মনে হয় প্রতিদিন নতুন একটা শার্ট গায়ে চড়াত। ময়লা কাপড়গুলো কখনও দেখিনি, ওগুলো কি করত কে জানে। বড় একটা ব্যাগ ভর্তি অলঙ্কারও ছিলো তাদের। হীরা, চুনি, পান্নার আংটি ছিল। টাইপিনও ছিল।' লাদেন ভ্রাতারা ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটি কটাতে লন্ডনেও গিয়েছিলেন। ওখানে টেমস নদীতে তাঁরা নৌকা ভ্রমণও করেছিলেন। এ সময়ের তোলা বিন লাদেন ও তাঁর ভ্রাতাদের ছবিও কারও কারও কাছে পাওয়া গেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে বিন লাদেন কি পরিমাণ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। অনেক সময় বলা হয়, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। ২৫ কোটি ডলার কি তারও বেশি। কিন্তু প্রকৃত অর্থের পরিমাণ হয়ত তার চেয়ে অনেক কম। অর্থের জন্য কখনও লালায়িত ছিলেন না তরুণ লাদেন। বস্তুত পক্ষে তাঁর পিতা যেভাবে অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন সেই বিষয়গুলো বিন লাদেনকে পীড়িত করতে শুরু করেছিল। সত্তরের

দশকের প্রথমভাগে মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল এক সাংস্কৃতিক রুপান্তর ঘটে গিয়েছিলো। তেল রাজস্ব, ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ এই ঘটনাগুলো আগের স্থিরকৃত বিষয়গুলোকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে বাধ্য করে। নতুন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে এ প্রশ্ন তুলে ধরে। মোহাম্মদ বিন লাদেনের অসংখ্য ছেলেমেয়ের অধিকাংশই সে প্রশ্নের জবাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ে। পরিবারের বড়রা মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার ভিক্টোরিয়া কলেজ, হর্ভার্ড, লন্ডন কিংবা মায়ামিতে পড়তে চলে যায়। কিন্তু বিন লাদেন যাননি। সে সময় এ অঞ্চলের আরও হাজার হাজার তরুণের মতো ওসামা বিন লাদেন কঠোর ইসলামী ভাবাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন।

র‍্যাডিকেল ভাবধারার পথে

১৯৭৪ সালে জেদ্দায় হাই স্কুলে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ওসামা বিন লাদেন ঠিক করলেন যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্য ভাইদের মত তিনি বিদেশে পাড়ি জমাবেন না, দেশেই থাকবেন। তার ভাই সেলিম তখন পরিবারের প্রধান। তিনি ইংল্যান্ডের মিলফিল্ডে সমারসেটের এক বোডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করেছিলেন। আরেক ভাই ইসলাম প্রথমে সুইডেনে ও পরে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। ওসামা কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি অনুষদে ভর্তি হন। গুজব আছে যে, ১৭ বছর বয়সে ওসামা তার মায়ের এক সিরীয় আত্মীয়কে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনিই নাকি তার প্রথম স্ত্রী। অবশ্য এটা আজ পর্যন্ত কোন মহল থেকেই সমর্থিত হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর লাদেনের ব্যবসায় সম্রাজ্য পরিচালনা করছিলেন বড় ভাই সেলিম। তিনি আশা করেছিলেন যে, ওসামা পারিবারিক ব্যবসায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ওসামার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিন লাদেনের পছন্দ ছিল ইসলামী শিক্ষা। পরবর্তীকালে তিনি এই দুটি বিষয়কে আশ্চর্য উপায়ে সমন্বিত করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণকারী জর্দানী শিক্ষাবিদ ও অনলবর্ষী বক্তা আব্দুল্লাহ আযযামের টেপ রেকর্ডকৃত বক্তব্য শোনেন। এগুলো তার ওপর সুগভীর প্রভাব ফেলে। আযযামের বাণীবদ্য উপদেশাবলী অনেকটাই ছিল আজকের ওসামার ভিডিও টেপের মতো। আযযামের সেই সব বক্তব্য শুধু

ওসামাকেই নয়; তার মতো আরো অনেক বিক্ষুব্ধ তরুণ মুসলমানের মনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল।

জেদ্দা তো বটেই বিশেষ করে সেখানকার বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র। জেদ্দার মসজিদ ও মাদরাসাগুলোতে বিরুদ্ধবাদীরা র‍্যাডিকেল ভাবধারা প্রচার করত। বলত যে, একমাত্র রক্ষণশীল ইসলামী মূল্যবোধের সর্বাত্মক পূনর্প্রতিষ্ঠাই মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্যের বিপদ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। বিন লাদেনের এক ভাই আব্দুল আজিজ এসময়ের কথা স্মরণকরে বলেছেন যে, ওসামা তখন সর্বক্ষণ বই পড়তেন আর নামায কালাম নিয়ে থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপে, বিশ্লেষণকরে ধর্ম বিষয়ক বিতর্ক ও কুরআন শিক্ষার পর্যালোচনায় তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ওসামা এসময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো সৌদি রাজ পরিবারের তরুণ সদস্য ও সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার ভাবী প্রধান প্রিন্স তুর্কি বিন ফয়সালের সংঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা।

তবে এসময়ের ঘটনা প্রবাহ তার মনে গভীর রেখাপাত করে। যেমন ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ইরান প্রত্যাবর্তন, পরাক্রান্ত শাহকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এ ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যুগপৎ উত্তেজনা ও আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। সে বছরের নভেম্বর মাসে শিয়া চরমপন্থীরা মক্কার কাবা শরীফের মসজিদুল হারাম দখল করে নেয়। ওসামা বিন লাদেন তখন বয়সে তরুণ। সহজে প্রভাবিত হবার মতো মন তখন তার। তিনি উত্তরোত্তর গোঁড়া মুসলমান হয়ে উঠছিলেন বটে, তবে কোন্ পথ বেছে নেবেন সে ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারছিলেন না। কাবা শরীফে উগ্রপন্থী হামলা ও মসজিদ দখলের ঘটনায় তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রচুর রক্ত পাতের পর শিয়া চরমপন্থীদের পারাস্ত করা হয়েছিলো। তবে এই উগ্রপন্থী বিদ্রোহীরা তাকে অনুপ্রাণিত করে। এদেরকে তার ন্যায় ও সত্যের পথ অনুসরণকারী খাঁটি মুসলমান বলে মনে হয়। অচিরেই ওসামা বিন লাদেন এদের পদাঙ্ক অনুসরণের সুযোগ পেয়ে যান। ঐ বছরের শেষ দিকে সোভিয়েত ট্যাংক বহর আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সোভিয়েত হামলার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় আফগান জনগনের জিহাদ এবং সেই জিহাদে অংশ নিতে

ওসামা বিন লাদেন এক পর্যায়ে সুদূর সৌদি আরব থেকে পাড়ি জমান আফগানিস্তানে।

রণাঙ্গনে

পেশোয়ার থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকলেই দেখা যাবে একটা ছোট্ট গ্রাম। নাম জাজি। ১৯৮৬ সালে এই গ্রামে সোভিয়েত গ্যারিসনের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায় আফগান মুজাহিদ বাহিনী। একদিন সকালে এই বাহিনীর এক সিনিয়র কমান্ডার সোভিয়েত সৈন্যদের মুহুর্মুহু মর্টার হামলার মুখে একটি বাঙ্কারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মর্টারের গোলায় একের পর এক বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এমনি সময় কোথা থেকে সেই বাঙ্কারে ডাইভ মেরে প্রবেশ করেন দীর্ঘদেহী একে আরব। তিনি আর কেউ নন ওসামা বিন লাদেন। লাদেন নিজে তখন সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। তাঁর 'স্থলযুদ্ধ' শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আশির দশকের মাঝামাঝি আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার হয়ে ওঠে। পেশোয়ারের ডর্মিটরিগুলো হাজার হাজার মুসলমান তরুণে ছেয়ে যায়। সবাই যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা নয়। কেউ এসেছিলো এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। কেউ সহকর্মী বা বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার টানে। কেউ বা আইনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়। তবে বেশিরভাগই এসেছিলো ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধ তথা জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য। এখানে আরও একটা কথা বলে নেয়া ভালো যে, সে সময় আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠার আংশিক কারণ ছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া। ১৯৮৬ সালের গোটা গ্রীষ্মকাল বিন লাদেন জাজি গ্রামটির আশপাশের লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একবার তিনি প্রায় ৫০ জন আরব যোদ্ধার একটি বাহিনী নিয়ে সোভিয়েত হেলিকপ্টার ও পদাতিক বাহিনীর টানা আক্রমণ প্রতিহত করেন। মিয়া মোহাম্মদ আগা নামে তখনকার এক সিনিয়র আফগান কমান্ডার বর্তমানে তালেবান বাহিনীতে রয়েছেন, তিনি সে সময় বিন লাদেনের যুদ্ধ তৎপরতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী তিন বছর বিন লাদেন আরও কঠিন লড়াই চালিয়ে যান। এতে অনেক সময় তাঁর নিজেরও জীবন বিপন্ন হয়েছিলো।

সুদানে নির্বাসন

কয়েক মাস আগে ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে আক্রমণ করেন। ওসামা বিন লাদেন সে সময় তাঁর জন্মস্থান জেদ্দা শহরে বসবাস করছিলেন। ইরাকী হামলা শুরু হবার পরপরই তিনি সৌদি রাজপরিবারের কাছে একটা বার্তা পাঠান। তাতে তিনি সাদ্দামকে পরাজিত করার জন্য আফগান যুদ্ধাভিজ্ঞ ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের একটি বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। বার্তায় লাদেন বলেন, যারা রুশ বহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে তারা সহজেই সাদ্দাম হোসেনকেও হারাতে পারবে। এমন একটা বাহিনী গঠিত হলে তিনি যে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন তা আর বলার অপেক্ষা ছিল না।

কিন্তু প্রস্তাবটা দিয়ে প্রচন্ড এক ধাক্কা খেয়েছিলেন বিন লাদেন। বড়ই নির্মম, বড়ই হৃদয়হীনভাবে। সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল সৌদ পরিবার ধর্মানুরাগী ইসলামপন্থীদের কোনো বাহিনী চাননি। একেবারে কিছুতেই না। রাজ পরিবারের সিনিয়র সদস্যরা লাদেনকে সাক্ষাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রস্তাবটা সটান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা। প্রিন্স আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাতকারটি ছিলো সেগুলোরই একটি। কিন্তু তার চেয়েও আরও খারাব কিছু অপেক্ষা করছিলো বিন লাদেনের জন্য। ইসলামের সূতীকাগার সৌদি আরব তথা পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনাকে রক্ষা করার জন্য যেখানে তিনি একটা ইসলামী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন এই দায়িত্বটাই তুলে দেয়া হয়েছে আমেরিকানদের হাতে। রাগে অপমানে ফুঁসতে লাগলেন বিন লাদেন। তাঁর দেশে তিন লাখ মার্কিন সৈন্য এসে পৌঁছল। তারা ঘাঁটি নির্মাণ শুরু করে দিল। মদ্যপান ও সানবাথিং করতে লাগল। এসব দেখে যাওয়া ছাড়া বিন লাদেনের আর কিছুই করার রইল না। তিনি এই সৈন্যদের উপস্থিতিকে বিদেশীদের আগ্রাসন বলে গণ্য করতে লাগলেন। বিন লাদেন একেবারে চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি গোটা উপসাগরের আলেম সমাজ ও জিহাদপন্থী মুসলমানদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে তিনি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। সেই পরিচিতিকে পুঁজি করে তিনি সৌদি আরবের সর্বত্র বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মসজিদগুলোর মাধ্যমে হাজার হাজার অডিও টেপ প্রচার করতে লাগলেন। বিন লাদেনের তৎপরতা এখানেই সীমাবদ্ধ রইল না। তিনি তার

সেনাবাহিনীর লোক রিক্রুট করার কাজ শুরু করলেন। ট্রেনিং লাভের জন্য প্রায় চার হাজার রিক্রুটকে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সৌদি শাসকগোষ্ঠী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। একদিন হানা দেয়া হলো লাদেনের বাড়িতে। গৃহবন্দী করা হল তাকে। উদ্বিগ্ন হলো বিন লাদেনের পরিবার। ওসামার কার্যকলাপের ফলে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভেবে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হলো। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। পরিশেষে তাঁরা বিন লাদেনকে সত্যিকার অর্থে ত্যাজ্য করতে বাধ্য হলো। লাদেনের উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পেল।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে লাদেনের জন্য একটা পালনের পথ দেখা দিল। বিন লাদেন সুদানের স্বনামধন্য ইসলামী তাত্বিক ও পন্ডিত হাসান আল তুরাবির কাছ থেকে আশ্রয়ের প্রস্তাব পেলেন। এই কিংবদন্তি পুরুষ তখন ছিলেন কার্যত সুদানের প্রকৃত শাসক। তুরাবি বিশ্বাস করতেন যে, সাদ্দাম হোসেনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ আরব সরকারগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করতে পারলে মুসলিম বিশ্বজুড়ে একটা 'বিশুদ্ধ' ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাওয়া যাবে। যাই হোক বিন লাদেনকে দেয়া তুরাবির প্রস্তাবটি সত্যই প্রলুব্ধকর ছিলো। সৌদি সরকারও লাদেনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এমন একটা সুযোগ পেয়ে নিজেদের কপালকে ধন্যবাদ দিলো। তারা বিন লাদেনের ওপর চাপের মাত্রাটা আরও বাড়াল, যাতে তিনি সৌদি আরব ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। চাপের মুখে বিন লাদেন এক সময় ভাগলেন। তিনি সৌদি আরব থেকে সুদানের রাজধানী খার্তুমে পালিয়ে গেলেন। সেই যে গেলেন আর তিনি স্বদেশে ফিরতে পারলেন না। ওসামা বিন লাদেন খার্তুমের অভিজাত শহরতলীতে চার স্ত্রী, সন্তানসন্ততি এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন নিয়ে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তারপর এক বৃহত্তর সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য আফগানিস্তান থেকে বিমানে করে যুদ্ধাভিজ্ঞ বেশ কয়েক শ' আরব স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে এলেন। সুদানে জীবনযাত্রায় বৈচিত্র ছিল। ফুটবল ম্যাচ হতো। নীল নদে সাঁতার প্রতিযোগিতা হতো। অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য শিয়া-সুন্নী ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কি না এ নিয়ে কমনরুম টাইপের বিতর্ক হতো। বিতর্ক হতো ইসলামী মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে। সুদানে বিন লাদেন নিজের নামে ব্যক্তিগত ব্যাংক এ্যাকাউন্টও খুললেন। তখন

লাদেনের বেশিরভাগ সময় বিশ্বব্যাপী জিহাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার চাইতে বরং অর্থোপার্জনের কাজেই ব্যয় হচ্ছিল।

ওসামা বিন লাদেনের সহায় সম্পদ নিয়ে কল্পনার শেষ নেই। লন্ডনে নিযুক্ত সৌদি আরবের প্রবীণ রাষ্ট্রদূত গাজী আল গোসাইবি সম্প্রতি বলেছেন: আমি এমন খবরও পাঠ করেছি যে, লাদেন ৩০ থেকে ৪০ কোটি ডলার সরাসরি লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক নয়। সৌদি আরব ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি ঐ পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নেননি। অন্যদিকে সৌদি কর্তৃপক্ষও সর্বদা শ্যেন দৃষ্টি রেখেছিল। যাতে সৌদি আরব থেকে লাদেন কানাকড়িও না নিয়ে যেতে পারেন। খার্তুমে বিভিন্ন সংগঠনের অফিস ছিল। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অফিসটি ছিল লাদেনের আল কায়েদা সংগঠনের। তাঁর সংগঠনটি অন্য যে কোনো সংস্থার মতোই পরিচালিত হত। সংগঠনের বোর্ড অব ডিরেক্টর বা পরিচালকমন্ডলী ছিল। বেশ কয়েকটি উপকমিটি ছিল। এসব কমিটি আর উপকমিটির অনবরত বৈঠক লেগেই থাকত। তার সংগঠন একটি ব্যবসায় কোম্পানি চালাত। যার নাম ছিল লাদেন ইন্টারন্যাশনাল। এছাড়া চালাত বৈদেশিক মুদ্রার ডিলারশিপ। চালাত একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এবং একটি কৃষিপণ্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বিন লাদেন রাজধানী খার্তুম থেকে পোর্ট সুদান পর্যন্ত সাতশ' মাইল দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তারই বিনিময়ে সুদান সরকার তাকে তিলের বীজ রপ্তানীর একক অধিকার প্রদান করে। সুদান হল বিশ্বের সর্বাধিক তিল উৎপাদনকারী তিনটি দেশের অন্যতম একটি দেশ। সুতরাং বলাই বাহুল্য সুদান থেকে তিল রপ্তানীর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। এই ব্যবসা থেকে বেশ ভালো মুনাফা করেছিলেন বিন লাদেন। তবে তার অন্যান্য ব্যবসা অতটা সফল হতে পারেনি।

আজারবাইজান থেকে বাইসাইকেল আমদানির একটা উদ্যোগ সম্পূর্ণ মার খেয়েছিল। আরও কিছু হঠকারী স্কিমও নেয়া হয়েছিল। সেগুলো আধাআধি বাস্তবায়িত হবার পর চোরাবালির মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারপরও আল কায়েদার মূল ব্যবসা কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ বিন লাদেনের হাতে ছিল। তবে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনে মূল যে উদ্দেশ্য সেটা কখনও বিন লাদেনের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়নি। জর্ডানের জিহাদপন্থী ইসলামীদের নগদ এক লাখ ডলারেরও বেশি দেয়া হয়েছিল। চেচনিয়ায় ইসলামী জিহাদীদের গোপনে নিয়ে

আসার জন্য বাকুতে অর্থ পাঠিয়ে দেয়া হয়। আরও এক লাখ ডলার পাঠানো হয় ইরিত্রিয়ার ইসলামী সংগঠনের জন্য।

এক পর্যায়ে বিন লাদেন আড়াই লাখ ডলার দিয়ে একটা প্লেন কেনেন। এবং এক পাইলটকে ভাড়া করেন। ক'দিন পরই বিমানটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়। তিনি সুদানে বেশ কয়েকটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেন। শত শত আলজেরীয়, ফিলিস্তিনী, মিসরীয় ও সৌদি নাগরিক এসব শিবিরে বোমা তৈরির কৌশলসহ নানা ধরনের জিহাদী কলাকৌশল শিক্ষা লাভ করে। এদের অনেকে আফগান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এসব ইসলামী মুজাহিদের মধ্যে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারককে হত্যার কথাবার্তা ওঠে। কিন্তু সেই হত্যা পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত ছিল না। নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসসহ পূর্ব আফ্রিকায় বোমা হামলার সম্ভাব্য টার্গেটগুলোর ওপর কিছু এলোমেলো গুপ্তচরগিরিও চালানো হয়েছিল।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারির মধ্যে সুদান তার বিশেষ অতিথি বিন লাদেনকে নিয়ে উত্তরোত্তর অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। হাসান আল তুরাবি তখন আফগানিস্তানে নিযুক্ত সুদানী রাষ্ট্রদূত আতিয়া বাদাবির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাদাবি পেশোয়ারে থাকতেন। রুশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তিনি পশতু ভাষা শিখেছিলেন। আফগান মুজাহিদদের অনেকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এবং কারোর কারোর সঙ্গে চমৎকার যোগাযোগও ছিল। আফগানিস্তান তখন বিবাদমান সেনা কমান্ডারদের নিয়ন্ত্রণাধীন শত শত এলাকায় খন্ড বিখন্ড ছিল। আতিয়া বাদাবি এমন এক পটভূমিতে জালালাবাদের সবচেয়ে সিনিয়র তিনজন কমান্ডারকে সহজেই একথা বুঝাতে পেরেছিলেন যে একজন ধনবান সৌদিকে তারা যদি নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে তাহলে তাদের অনেক লাভ হবে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে তিন কমান্ডার এরপর সুদানে গিয়ে সরাসরি বিন লাদেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই তিনজন কমান্ডারের কেউই আজ জীবিত নেই।

১৯৯৬-৯৮ মুজাহিদ বাহিনী গঠন

কাবুলে শরতের এক সন্ধা। উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলী ওয়াজির আকবর খানের উঁচু দালানঘেরা এক বাড়ির বাইরে ডজনখানেক জাপানী পিক আপ ট্রাক দাঁড়ানো। ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষী ও ড্রাইভাররা রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পর থেকে সাত বছরে বড় ধরনের কোন লড়াই এখানে না হলেও প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে এবং সেগুলোর সামনে স্তূপ করে রাখা বালির বস্তার গায়ে গুলির বা বোমার টুকরার আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে ১৯৯৬ সালের অক্টবর মাস তখন। ওসামা বিন লাদেন তালেবান নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাবুলে এসেছেন। নগরীতে ওটাই ছিল তার প্রথম আগমন এবং একমাস আগে ক্ষমতা দখলকারী কট্টর ইসলামী মিলিশিয়া বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে ওটাই ছিল তার প্রথম সাক্ষাত। সে বছরের মে মাসের বিশষভাবে ভাড়া করা এক পরিবহন বিমানে করে ৩৯ বছর বয়স্ক বিন লাদেন তার চার স্ত্রীর মধ্যে তিন স্ত্রী, আধ ডজন ছেলে মেয়ে ও তার অনুসারী শ খানেক আরব যোদ্ধা জালালাবাদ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান। কিন্তু যে তিনজন মুজাহিদ কমান্ডার সুদান থেকে তাকে আফগানিস্তানে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তারা এ কয়েক মাসের মধ্যে উৎখাত হয়ে যান এবং এ অবস্থায় বিন লাদেনের আফগানিস্তানের নতুন সরকারের অনুগ্রহভাজন হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক মাস আগে বিন লাদেন তার এক লিবীয় সহযোগীকে কান্দাহারে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মোল্লা ওমর তখন তালেবান উপনেতা ও কাবুলের মেয়র মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানীকে বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাত করার নির্দেশ দেন এবং তিনি সত্যি কতটা বন্ধুভাবাপন্ন তা যাচাই করে দেখতে বলেন। সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে এক বৈঠক হয় এবং ঐ বৈঠক উপলক্ষেই কাবুলে এসেছিলেন বিন লাদেন। বৈঠকে দু'পক্ষই ছিলেন সতর্ক অথচ বন্ধুভাবাপন্ন। লাদেনই প্রথম কথা বলেন। নিজেদের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে তিনি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য এবং অর্জিত সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং নিঃশর্তভাবে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। রব্বানী খুবই খুশি ও তুষ্ট হন। তিনি বিন লাদেনকে সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বৈঠক থেকে সবাই হাসি মুখে বেরিয়ে আসে। লাদেন ও তালেবানদের মধ্যে এই মৈত্রী নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটা ছিল বিন লাদেনের বিকাশের চূড়ান্ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা। তালেবানদের নিরাপত্তা আদায় করতে সক্ষম হয়ে তিনি এবার বিশ্বের

এযাবতকালের সবচেয়ে দক্ষ একটি জিহাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ নিয়ে বিন লাদেন অতি প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসই কেবল অর্জন করেননি, গোটা ইসলামী বিশ্বে যোগাযোগের এক ব্যাপক বিস্তৃত নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছিলেন। তদুপরি খ্যাতি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসার স্বাদও পেয়েছিলেন তিনি। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা লাদেনের পরিচিতি ও কর্তৃত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। সুদানে তিনি গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য স্থানের অনৈসলামীক সরকারগুলোকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মুসলিম জিহাদীদের ছত্রছায়া সংগঠন আল কায়েদা গঠনের কাজে গুরুত্বের সাথে হাত দিতে সক্ষম হন। তবে সামরিক শক্তি-সামর্থ্য ও রণকৌশলগত চিন্তাধারার দিক দিয়ে বিন লাদেনের এই সংগঠনটি তখনও যথেষ্ট দুর্বল ছিল। আফগানিস্তানে এসে তিনি এ সমস্যার দ্রুত একটা সমাধান খুঁজে পান। তিনি এমন একটি দেশে ফিরে আসেন যেখানে ছয় বছর ধরে নৈরাজ্য চলছিল। হাজার হাজার জিহাদপন্থী মুসলিম দেশের পূর্বাঞ্চলে মুজাহিদদের পুরনো কমপ্লেক্সগুলোতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। এদের অনেককে পৃষ্ঠপোষকতা করতো পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। যারা এই ধর্মানুরাগী যুদ্ধাদেরকে কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করতে চাইতো। অন্যরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো সমগ্র বিশ্বের নানা মত ও পথের ইসলমী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে।

এসব জিহাদীদের শিবিরে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবককে গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হতো। এই স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। আফগানিস্তানে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিন লাদেনের প্রথম সমস্যাটির আংশিক সমাধান হয়ে যায়। তিনি একটা তৈরি সেনাবাহিনী পেয়ে যান।

আফগানিস্তানে বিন লাদেনকে সাহায্য করার জন্য তাঁর চার পাশে অসংখ্য লোক এসে জড়ো হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ছিল কয়েক ডজন প্রবাসী মিসরীয় কট্টোর ধর্মানুরাগী মুসলিম। এদের মধ্যে ছিলেন ৩৭ বছর বয়স্ক শল্য চিকিৎসক ও মিসরের আল-জিহাদ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ডা. আইমান আল জাওয়াহিরি। আরেকজন ছিলেন ঐ গ্রুপেরই লৌহমানব ও সুযোগ্য সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ আতেফ। আল জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন। আর মোহাম্মদ আতেফ তাকে সামরিক ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো একান্ত প্রয়োজন সে গুলোর গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন।

বেশ কিছু নিরাপত্তাগত ঝুঁকি দেখা দেয়ার পর বিন লাদেন তার আবাসস্থল জালালাবাদের দক্ষিণে পাহাড়ি অঞ্চলের তোরাবোরা নামক একটি স্থানে এক প্রাক্তন মুজাহিদ ঘাঁটিতে সরিয়ে নেন।

মহানুভবতা

প্রথম প্রথম নিজেকে একটু আড়ালে-অন্তরালে রাখতেন ওসামা বিন লাদেন। কখনই পাদপ্রদীপের আলোয় আসতেন না তিনি। পাকিস্তানী সাংবাদিকদের মনে আছে, আশির দশকের প্রথম দিকে তারা একজন সৌদি শেখ সম্পর্কে অনেক রকম কাহিনী শুনেছিলেন। এই শেখ পেশোওয়ার শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে আহত যোদ্ধাদের দেখতে আসতেন । তাদেরকে কাজুবাদাম, চকোলেট উপহার দিতেন। তাঁদের নাম ঠিকানা টুকে নিতেন। ক'দিন পরই মোটা অঙ্কের একটা চেক পৌঁছে যেত তাদের পরিবারের হাতে। এধরনের মহানুভবতা সম্ভবত বাবার কাছে শিখেছিলেন ওসামা বিন লাদেন। কারণ, বাবাকে মাঝে মাঝে গরিবদের মধ্যে থোকা থোকা নোট বিলাতে দেখতেন তিনি। যারা লাদেনের জন্য লড়েছেন কিংবা লাদেনের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছেন তাঁদের প্রায় সবাইকে বিন লাদেনের এই মহানুভবতার কথা উল্লেখ করতে শোনা গেছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন যে বিয়ের জন্য দেড় হাজার ডলার দান পেয়েছেন বিন লাদেনের কাছ থেকে। আবার কেউ বলেছেন জুতা বা ঘড়ি কেনার জন্য বিন লাদেনের কাছ থেকে নগদ অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা বলেন, বাইআ'ত বা শপথ উচ্চারণের যে কাজ এধরনের দান-সাহায্য বা উপহারও সেই একই কাজ করেছে। তাঁদের আমীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বিন লাদেনের সময় ছিল তাঁর অর্থের মতোই মূল্যবান। তা সত্ত্বেও যে কাউকে যে কোন রকম সাহায্য করতে তিনি কখনই বিমুখ হতেন না। একজন আফগান মুজাহিদ স্মরণ করেছেন কিভাবে বিন লাদেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সেই মুজাহিদ একবার আরবী শিখতে চাইলেন। বিন লাদেন সে সময় ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি এই সৌদি যুবক তাঁকে কুরআনের ভাষা- আরবী ভাষা শিখানোর কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছিলেন। বিন লাদেন একজন র‍্যাডিক্যাল বা কট্টোর ধর্মানুরাগী হিসেবে সুপরিচিত। তথাপি আচার-ব্যবহারে তিনি বরাবরই শান্ত, নম্র ও মিতভাষী।

যেমনটি তিনি ছেলেবেলায় ছিলেন; বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর শিক্ষকরা। ১৯৮৪ সালে বিন লাদেন ও আযযাম পেশোয়ারের শহরতলিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগরীতে আগমনরত হাজার হাজার আরব মুজাহিদের জন্য একটি সরবরাহ ঘাঁটি স্থাপন করেন। এবং সেটার নাম দেন বায়তুল আনসার বা বিশ্বাসীদের গৃহ। বিন লাদেন সেখানে আরব স্বেচ্ছসেবকদের গ্রহন করতেন। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতেন। তার পর বিভিন্ন আফগান সংগঠনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বিন লাদেনের এসব কাজ-কর্ম "সিআইএ" পাকিস্থানের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএস আই" এবং সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা "ইশতেকবরাতের" জানা ছিল। কিন্তু এদের সকলেই এগুলো দেখেও না দেখার ভান করে ছিল। তবে এদের কেউই বিন লাদেনকে আমেরিকান সাহায্য দেয়নি। কোনভাবেই না। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান শাহজাদা তুর্কী আল ফয়সাল হলেন বিন লাদেনের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। সে সময় তিনি এ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। "বায়তুল আনসার" কার্যালয়টি ছিল সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী সড়কের পাশে। এলাকাটি শান্ত, নিস্তরঙ্গ। চারদিকে বোগেইন ভিলার গাছ এবং স্থানীয় অভিজাতদের বড় বড় বাড়ি। আশির দশকের মাঝামাঝি এলাকাটি আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন সংগঠন সেখানে অফিস খুলে বসেছিল। ওখান থেকে দু'টো খবরের কাগজ বের হতো যার একটির প্রকাশক ছিলেন আব্দুল্লাহ আযযাম ও বিন লাদেন। একটা নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ অফিসও ছিল ওখানে। অফিসটা ছিল বিন লাদেনের ভাড়া নেয়া একটা ভবন, যেখানে বসে মুজাহিদ সংগঠনের নেতারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের তাদের মতপার্থক্য দূর করতে পারতেন। ওখানকার পরিবেশ ছিল ক্লেশকর। আরাম-আয়েশের কোন ব্যবস্থাই ছিলনা ওখানে। অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বিন লাদেনসহ দশ-বারোজন স্বেচ্ছাসেবক মিলে একটা রুমে ঘুমাতেন। অফিস রুমের কঠিন মেঝেতে পাতলা তোশক বিছিয়ে শয্যা রচনা করা হতো। বিন লাদেন গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে বসে ইসলাম ও মধ্যপ্রচ্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন পর্যন্ত বিন লাদেনের মধ্য র‍্যাডিক্যাল ভাবাদার্শ গড়ে ওঠেনি। বরং তাঁর তখনকার চিন্তাধারার মধ্যে খানিকটা ইতিহাসের স্মৃতি এবং খানিকটা চলমান ঘটনার ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে মিশেল ছিল। বিন লাদেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবদের সঙ্গে বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতায়

বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। সৌদি রাজপরিবারের উপরও তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবং বলতেন যে ক্ষমতা করায়ত্ব করার জন্য তারা ওহাবীদেরকে কাজে লাগিয়েছে। বিন লাদেন স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্ক পরিচালনা করতেন। অনেক সময় বিতর্কের বিয়বস্তু হতো "সূরায়ে ইয়সিন"। ইসলামী ইতিহাসের বীর যোদ্ধাদের নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন তিনি। সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কথা বলতেন। বলতেন অন্য বীরদের কাহিনী। এভাবে যেন তিনি নিজেই নিজেকে বৃহত্তর কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

ধর্মীয় অনুরাগ

সুদানে নির্বাসিত জীবনযাপন শুরুর আগেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে বিন লাদেন অসমসাহসিকতার বেশ কিছু স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কট্টোরপন্থী সংগঠন হিজবে ইসলামীর এক নেতা জানান যে, তিনি নিজে দেখেছেন একবার সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবার পর প্রচন্ড গোলাবর্ষণের মুখে বিন লাদেন কিভাবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। বর্তমানে বিন লাদেনের ঘোরবিরোধী এমন অনেকেও যোদ্ধা হিসাবে তাঁর বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ দিয়েছেন। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি যে আদৌ ভাবতেন না সে কথা তাঁদের সবাই উল্লেখ করেছেন। এভাবে একজন ধর্মপ্রাণ যুবক ক্রমান্বয়ে একজন সাচ্চা জিহাদীতে পরিণত হন। বিন লাদেনের ধর্মীয় অনুরাগ তার লোকদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। ওসামার নিজের বর্ণিত একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল ১৯৮৯ সালে পূর্বাঞ্চলীয় নগরী জালালাবাদ দখলের লড়াইয়ের সময়কার। ওসামার নিজের ভাষায়: "আমি তিনজন আফগান ও তিনজন আরবকে এনে একটা অবস্থান দখল করে রাখতে বললাম। তারা সারা দিন লড়াই চালাল। সন্ধ্যায় তাদের অব্যাহতি দেয়ার জন্য আমি ফিরে গেলে আরবরা কাঁদতে শুরু করে দিল। বলতে লাগল তারা শহীদ হতে চায়। আমি বললাম ওরা যদি এখানেই থেকে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যায় তাহলে তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হতে পারে। পরদিন তারা সবাই শহীদ হল।" ওসামা পরে বলেন, তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন যে রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চই হলো তাদের বেহেশতে যাবার পথ।

সঙ্গী ও অনুসারীদের সাথে অনেক দিক দিয়ে নিজের কোন পার্থক্য রাখতেন না ওসামা বিন লাদেন। তিনি যে এত ধনী ছিলেন কিংবা একজন কমান্ডার ছিলেন অনেকেই তা জানত না। সবার সাথে বন্ধুর মতো একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন ও ঘুমাতেন তিনি। কখনও কখনও আফগানদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য নিজ উদ্যোগে সমঝোতার চেষ্টা চালাতেন। আফগান প্রতিরোধযুদ্ধে মুজাহিদ যোগান দেয়ার যে দায়িত্ব তিনি নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন তা অব্যাহত থাকে। সিআইএ সূত্রে হিসাব করে দেখা গেছে যে, জিহাদের জন্য আফগানিস্তানে বছরে তিনি ৫ কোটি ডলার সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী এক যোদ্ধার কাছ থেকে জানা যায় জালালাবাদ দখলের লড়াই চলাকালে তিনি পথের পাশে ধূলি ধূসরিত বিন লাদেনকে মুজাহিদদের জন্য খাদ্য, কাপড়চোপড়, বুট জুতা প্রভৃতি সরবরাহের আয়োজন করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো ইসলামী চিন্তাধারার অনুসারী যিনি নন তাঁর সঙ্গে বিন লাদেনের কিছুতেই বনিবনা হতো না। সৈয়দ মোহাম্মদ নামে আরেক আফগান মুজাহিদ জানান, একবার এক যুদ্ধে বিন লাদেন তাঁর সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ শুধু একটাই- তিনি দাড়ি-গোফ সম্পূর্ণ কামানো ছিলেন। আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় বিন লাদেন মিডিয়ার শক্তিটা টের পেতে শুরু করেছিলেন। আফগানযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন কাহিনী পেশোয়ারস্থ আরব সাংবাদিকদের হাত হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর অনুকূল প্রভাব পড়ে। বন্যার ঢলের মতো দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে জড়ো হতে থাকে তাঁর পিছনে। তাঁর প্রতি লোকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। এমন মর্যাদা এর আগে আর কখনও লাভ করেননি বিন লাদেন।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। কাবুলে রেখে যায় এক পুতুল সরকার। আফগানিস্তানে এবার শুরু হয় নতুন লড়াই। সে লড়াই আফগানদের নিজেদের মধ্যে- মুজাহিদে মুজাহিদে লড়াই। এ অবস্থায় আরব আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের যুদ্ধে পোড়খাওয়া হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের আফগানিস্তানের মাটিতে পড়ে থাকার আর কোন কারণ ঘটেনি। তাদের অনেকেই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানিস্তান থেকে নিজ নিজ দেশে পাড়ি জমায়। আফগানদের এই ভ্রাতৃঘাতী লড়াই থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিন লাদেনও

পাড়ি জমান নিজ দেশে। সত্যি বলতে কি, তিনি এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ লক্ষ্য করে অতিমাত্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। নিজে অতি সৎ, অতি বিশ্বস্ত মানুষ বিন লাদেন। আফগানদের আত্মকলহে লিপ্ত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছিলেন। তিনি এ সময় তাদের বলেছিলেন যে সোভিয়েতের মতো একটা পরাশক্তিকে তাঁরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করেছেন শুধু একটি কারণে- তাঁরা নিজেরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ এবং তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছিল। একতাবদ্ধ না থাকলে এ বিজয় অর্জন তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এত বড় বিজয়ের পর আফগানদের নিজেদের মধ্যে নতুন করে রক্তক্ষরণ দেখে হতাশার গ্লানি নিয়ে বিন লাদেন ফিরে যান স্বদেশ সৌদি আরবে। তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর। সময়টা ১৯৯০- এর শরৎ। সৌদি আরবের প্রকৃত শাসক প্রিন্স আবদুল্লাহ যুবক ওসামা বিন লাদেনের কাঁধে তাঁর নরম থলথলে হাতটা রাখলেন। মৃদু হাসলেন। বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো মধুর শোনাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে আপোসের সুর ছিল। তবে সন্দেহ নেই সেসব কথার আড়ালে লুকিয়ে ছিল কঠিন কঠোর হুমকি।

ওসামা বিন লাদেন আফগানযুদ্ধাভিজ্ঞ একজন আরব স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে রিয়াদে প্রিন্স আবদুল্লাহর সাথে তাঁর প্রাসাদে দেখা করতে এসেছিলেন। মনোরমভাবে সাজানো লাউঞ্জে আফগান ভেটারেনদের উদ্দেশ্যে প্রিন্স আবদুল্লাহ বললেন, "মোহাম্মদ বিন লাদেনের পরিবার বরাবরই আমাদের এই রাজ্যের বিশ্বস্ত প্রজা। প্রয়োজনের সময় এই পরিবার আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, কাউকে এমন কিছু করতে দেয়া হবে না যাতে আমাদের এই সুসম্পর্ক ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রিন্স আবদুল্লাহর কথায় শ্রদ্ধাবনতভাবে মাথা নেড়েছিল। কিন্তু যার উদ্দেশে কথাগুলো উচ্চারিত হয় সেই বিন লাদেন তাঁর অবদমিত ক্রোধ ভিতরেই চেপে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছিলেন। বস্তুতপক্ষে আবদুল্লাহর কথায় তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, সেটা তাঁর চোখমুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবদুল্লাহর কথায় তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন।

বিশ্বজিহাদ ফ্রন্ট

মিসরীয় সহকর্মীদের কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছিলেন বিন লাদেন। তা হলো, আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বোত্তম কৌশল। তাদের এই পরামর্শ মতো তিনি কাজ করেছিলেন। তোরাবোরা ঘাঁটিতে দু'মাস কাটানোর পর বিন লাদেন বারো পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ লিখেন ও বিলি করেন। তাতে কুরআন ও ইতিহাস থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছিল। এবং অঙ্গিকার করা হয়েছিল যে, আমেরিকানরা সৌদি আরব থেকে সরে না গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। নিবন্ধে প্রথমবারের মতো তিনি ফিলিস্তিন ও লেবাননের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃস্টানদের হিংসার অপপ্রচারের উল্লেখ করে বলেন, তাদের এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। এ ধরনের অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়ভাবে প্রসারিত হয়। এর পিছনে মিসরীয়দের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

আফগান মুজাহিদদের সিআইএ বেশ কিছু স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েছিল। বিন লাদেন তাদের কাছ থেকে চারটি স্ট্রিংগার কিনে নিয়ে সৌদি ইসলামী গ্রুপগুলোর কাছে গোপনে পাচার করেন। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে রিয়াদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। পাকিস্তানের মতো সৌদি আরবও আফগানিস্তানে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাব খর্ব করার জন্য তালেবানদের সাহায্য সমর্থন দিয়েছিল। এখন সেই তালেবানরাই সৌদিদের ঘোরতর এক শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাকে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের দাবি অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে অনুভব করছে সৌদি আরব।

১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে তালেবানরা বিন লাদেনকে হত্যার একটি সৌদি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে। আফগানিস্তানের তখন প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এলাকা এই মুজাহিদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। হত্যা ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হবার পর তালেবানরা বিন লাদেনকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য কান্দাহারে চলে যেতে বলে। বিন লাদেন রাজি হন এবং কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছাকাছি সোভিয়েত বিমানবাহিনীর একটি পুরনো ঘাঁটিতে চলে যান। ইতোমধ্যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সাজসরঞ্জাম কেনার অর্থ যুগিয়ে, মসজিদ তৈরি করে এবং নেতৃবৃন্দকে গাড়ি কিনে দিয়ে বিন লাদেন তালেবান হাই কমান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। তিনি কান্দাহার নগরীর উপকণ্ঠে মোল্লা ওমর ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি নতুন বাসভবনও তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বিন লাদেন আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো থেকে সেরা শিক্ষার্থীদের আল-কায়েদায় নিয়ে নেয়ার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশাসকরা স্বেচ্ছাসেবকদের বলত যে, তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবেন তাঁদের 'আমীরের' সামনে হাজির করা হবে। আমীর বিন লাদেনের সামনে হাজির করার পর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে চৌকশ ও প্রতিভাবান যুবকদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য বেছে নেয়া হতো। এই বিশেষ শিবিরে তাদের পদাতিক বাহিনীর মৌলিক কলাকৌশল শিখানো হতো না বরং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেয়া হতো। যুদ্ধের মহড়ার আয়োজন করা হতো এবং পরিশেষে আধুনিক জিহাদের দক্ষতা ও কৌশল শিখানো হতো। এক বছরের মধ্যে বিন লাদেন মুজাহিদদের একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলেন। ডা. আইমান আল জাওয়াহিরির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিন লাদেন এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়ছেন সেটাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা দরকার।

১৯৯৭ সালের শেষদিকে তিনি ইসলামী সংগঠনগুলোকে আল কায়েদার ছত্রছায়ায় একতাবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। তিনি সারা বিশ্বের মুসলিম নেতাদের একই উদ্দেশ্যের পিছনে টেনে আনার জন্য নিজের অর্থবিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবকিছুই কাজে লাগিয়েছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ের ইসলামী আন্দোলনগুলোর প্রতি তিনি তাঁর সাহায্য-সমর্থন জোরদার করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রামের ইমাম আলেমদের হাতে টাকা দেন। তালেবান সূত্রে জানা যায় যে, দুবাই থেকে তিনি তিন হাজার সেকেন্ডহ্যান্ড টয়োটা করোলা গাড়ি আমদানির ব্যবস্থা করেন। জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হিসাবে এই গাড়িগুলো যুদ্ধে শহীদ তালেবানদের পরিবারের হাতে দেয়া হয়।

পরিশেষে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিন লাদেন 'বিশ্বজিহাদ ফ্রন্ট' এর নামে ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া জারী করেন। বিন লাদেন, আল জাওয়াহিরি এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ইসলামী আন্দোলনের নেতারা ফতওয়ায় স্বাক্ষর দেন। এবং গোটা অঞ্চলের ডজনখানেক সংগঠন ফতওয়া অনুমোদন করে। পাশ্চাত্যের ইসলাম সম্পর্কিত এক বিশেষজ্ঞের মতে ফতওয়াটি ছিল অলঙ্কারপূর্ণ আরবী গদ্যের এক অপরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত। এমনকি ওটাকে অসাধারণ কাব্যিকও বলা যায়।

অবশ্য এর বক্তব্য বিষয়টা মোটেও কাব্যিক ছিল না। কারণ ফতওয়ায় বলা হয়েছিল যে, আমেরিকান ও তাদের মিত্রদের- এমনকি তারা যদি অসামরিক ব্যক্তিও হয় তাহলেও তাদের হত্যা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এর অল্পদিন পরই এক সাক্ষাতকারে বিন লাদেন বলেন যে, খবু শীঘ্রই র*্যডিকেল কার্যক্রম শুরু হবে। সেটা শুরু হলো ১৯৯৮ সালের সাত আগস্ট। ঐ দিন সকাল এগারো'টায় মুহাম্মাদ রশিদ দাউদ আল-ওহালী নামে ২২ বছরের এক সৌদি যুবক নাইরোবি শহরতলীর এক হাসপাতালের নিচ তলায় পুরুষদের একটি টয়লেটে দাঁড়ানো ছিল। যুবকটির মুখে দাড়ি। শীর্ণ কাঁধ। এক সেট চাবি ছিল তার হাতে এবং তিনটি বুলেট। যুবকটির পরনে ছিল জিনসের প্যান্ট, একটা সাদা রঙের কারুকাজ করা শার্ট। পায়ে মোজা ও কালো জুতা। তাঁর পোশাকে রক্তের দাগ ছিল। হাতে যে চাবিগুলো ছিল সেগুলো একটি হালকা বাদামী রঙের টয়োটা পিকাপ ট্রাকের পিছনের দরজার চাবি। ৩৪ মিনিট আগে গাড়িটি এক প্রচ- বিস্ফোরণে উড়ে যায়। বিস্ফোরিত বোমাটি ঐ গাড়ির ভিতরেই রাখা ছিল। বিস্ফোরণে মার্কিন দূতাবাস, একটি অফিস ব্লক এবং একটি সেক্রেটারিয়ান কলেজ বিধ্বস্ত হয়। নিহত হয় ২১৩ জন। আহত হয় ৪৬০ জন। প্রায় একই সময় তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে দ্বিতীয় একটি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ১১ জন।

আল ওহালীর ট্রাকের ড্রাইভার ছিল আযযাম নামে আরেক সৌদি যুবক। বিস্ফোরণে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারা দু'জন টয়োটা ট্রাকটি নিয়ে সবেগে দূতাবাসে ঢুকে পড়ার সময় শাহাদাতবরণের আরবী গান গাইছিল। যদিও সে সময় তাঁরা ভেবেছিল যে, দু'জন একত্রে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় না। চালকের আসনে বসা আযযাম ড্যাশবোর্ডর সঙ্গে টেপদিয়ে আটকানো ডেটোনেটরের বোতামে চাপ দেয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরণে তার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আল ওহালি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে তিনি এফবিআই কে জানান যে, ১৯৯৭ সালের প্রথম ভাগে আফগানিস্তানে ট্রেনিং নেয়ার সময় তাকে বেছেনিয়ে ছিলেন ওসামা বিন লাদেন। এরপর তাকে সে বছরের গ্রীষ্মে তালেবানদের পক্ষে লড়াই করার জন্য পাঠানো হয়। অতপর তাঁকে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে আল কায়েদার ইন্সট্রাক্টরদের হাতে জিহাদের উপর বিশেষ ধরণের ট্রেনিং নিতে পাঠানো হয়। পরিশেষে এপ্রিল মাসে তাকে নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার মিশনে নিয়োগ করা হয়। আযযাম ও একই পথ অনুসরণ করেছিল।

আফ্রিকায় বোমা বাজির দুটো ঘটনার তেরো দিন পর ৭৫ টি মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলিয় পার্বত্য এলাকার ছয়টি প্রশিক্ষণ শিবিরে আঘাত হানে। অপর ক্ষেপনাস্ত্রগুলো সুদানের একটি মেডিকেল কারখানা ধ্বংশ করে দেয়। মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে যায়। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয়ে আবির্ভূত হন ওসামা বিন লাদেন।

—-চলমান।

(collected)

পর্ব ১-৭ এর বাকি অংশঃ

অনুবাদকের ভূমিকা

বিশ্বময় জিহাদিদের অবাধ বিচরণ। জিহাদের পদচারণা থেকে কোন রাষ্ট্র, কোন অঞ্চলই যেন বাকি নেই। মহা প্ররাক্রান্ত আমেরিকার মাটিও নয়। ইতোমধ্যে বলকান অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান হয়ে ফিলিপিন্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এক নতুন ধরণের জিহাদ। বিশ্ব কট্টরপন্থী মুসলিমদের জিহাদ। সেই জিহাদের প্রাণ পুরুষ আজ ওসামা বিন লাদেন। তার গুপ্ত বাহিনীর সদস্যরা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের দেশে দেশে। জিহাদ চালানোর জন্য তারা তৎপর রয়েছে বসনিয়া, আলবেনিয়া, কাশ্মিরে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিন লাদেন হয়ে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত পুরুষ। আমেরিকার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন সর্বাত্মক যুদ্ধ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের ঘাঁটিতে ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র হেনে লাদেনকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। পারেনি! পারেনি! এখন জীবিত হোক, মৃত হোক তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। আমেরিকা লাদেনের মাথার দাম ঘোষণা করেছে ৫০ লাখ ডলার। কিন্তু লাদেন যেন প্রহেলিকা। তাকে ধরা যায় না-ছোঁয়া যায় না। বিশ্বজুড়ে লাদেন বাহিনীর জিহাদী কর্মকান্ডের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ১৯৯৮ সালের আগষ্টে নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসের বাইরে যুগপত বোমা বিস্ফোরণ তার অন্যতম। এ বছর প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের বাংলাদেশ সফর

কালে জয়পুরা গ্রাম পরিদর্শনের কর্মসূচি শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ নাকি গোপন সূত্রে খবর পায় যে, লাদেন বাহিনী চোরাগোপ্তা আঘাত হানতে পারে।

কে এই ওসামা বিন লাদেন? কিভাবে কোন পটভূমি থেকে ঘটল তার উত্থান? কেমন করেই বা চালিত হয় তার গুপ্ত বাহিনীর কর্মকাণ্ড-? তিনি কি পথভ্রষ্ট কোন সন্ত্রাসী মাত্র? নাকি নিশির মতো ঘোরে পাওয়া এক সৌদি বিলিওনেয়ার যিনি ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবন ছেড়ে সুদূর আফগাস্তিানের এক গুহায় বসে জাল বুনে চলেছেন তার বিশ্ব পরিকল্পনার?

ইয়োসেফ বাদানস্কির 'বিন লাদেন॥ দি ম্যান হু ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন আমেরিকা' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে এখানে পরিবেশিত হচ্ছে সেই বহুল আলোচিত মানুষটির বিচিত্র কাহিনী।

প্রথম জীবন

ওসামা বিন লাদেন। শীর্ণ একহারা গড়ন। শশ্রুমন্ডিত চেহারা। বয়স ৪৩ এর মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই মানুষটির কম্পিউটারের ওপর ভাল দখল আছে। চার স্ত্রী ও ১৫টির মতো ছেলেমেয়ে। তাদের নিয়ে বসবাস করছেন আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের একটি গিরিগুহায়। সেখানে ট্যাপের পানি সেই। শীতের হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচবার জন্য গুহাটিকে গরম রাখার কোনরকম ব্যবস্থা আছে মাত্র। আর সেই সঙ্গে আছে গুপ্তহত্যা, কমান্ডো আক্রমণ ও বিমান হামলার আশঙ্কা। এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয় লাদেনকে। অথচ এমনি ঝুঁকিময়, বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত জীবন যাপন করার কথা ছিলো না লাদেনের। বাবার পথ ধরে তিনি হতে পারতেন সৌদি আরবের একজন নামী নির্মাণ ঠিকাদার। হতে পারতেন একজন ধনকুবের, যার ব্যংক ব্যালেন্স থাকত শত শত কোটি ডলারের। অথচ তিনি প্রাচুর্যের জীবন ছেড়ে বেছে নিয়েছেন এক বন্ধুর পথ। অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে থেকে তিনি নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন এমন এক মিশনে যার নাম তিনি দিয়েছেন 'জেহাদ'। জিহাদের জন্য উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন পরিত্যাগ করেছেন এমন মানুষ অবশ্য বিন লাদেন একা নন, আরও অনেকেই আছেন। তাদের একজন ডা. আইমান আল জাওয়াহিরি। ইনি লাদেনের দক্ষিণ হস্ত। চল্লিশের শেষ কোটায় বয়স। মিসরের অন্যতম শীর্ষ শিশুরোগ

বিশেষজ্ঞহতে পারতেন তিনি। কিন্তু বিপুল সম্ভামনাময় ক্যারিয়ার ও প্রাচুর্যের জীবন ছেড়ে তিনি মিসর সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য হন। লোভনীয় পারিশ্রমিকে তাকে পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। লাদেন ও জাওয়াহিরী আজ পাশ্চাত্যের চোখে সবচেয়ে কুখ্যাত মুসলিম জিহাদী নেতা। তবে তাঁরাই একমাত্র নন। এঁদের মতো আরও শত শত অধিনায়ক আছেন এবং তাদেরও প্রত্যেকের অধীনে আছে হাজার হাজার জিহাদী। এঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট তথা গোটা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন 'জিহাদে' লিপ্ত। ১৯৯৮ সালের আগস্টে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ তাদের সর্বশেষ বড় ধরণের জিহাদী হামলার দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই নব্য র*্যডিকেল ইসলামী এলিটদের আবির্ভাব উন্নয়নশীল বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনা। সধারণত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও বিক্ষুব্ধ অংশ থেকে সন্ত্রাসবাদী ও র*্যডিকেলরা জন্ম নিলেও এই নেতারা এসব শ্রেণী থেকে আসেননি, এসেছেন বিত্তবান ও বিশেষ সুবিধাভোগী অংশ থেকে। এঁরা শুধু উচ্চ শিক্ষিতই নন, পাশ্চাত্যের মননশীলতার দ্বারাও প্রভাবিত। ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের থেকেও তাঁরা আলাদা। ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল জাওয়াহিরি এবং তাঁদের সত্তর ও আশির দশকের টালমাটালময় সময়ের ফসল। বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে তাদের জিহাদী রাজনীতি র‍্যাডিকেলিজমকে আলিঙ্গন করার ব্যাপারটা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলো হলো সত্তরের দশকে তেলের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে একই সঙ্গে আরব জাতির সমৃদ্ধি ও সত্তার সঙ্কট, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় এবং আশির দশকের আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী সংগ্রাম। ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেনের জন্ম সম্ভবত ১৯৫৭ সালে সৌদি আরবের রিয়াদ নগরীতে। বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেন তখন ছিলেন ছোটখাটো একজন ঠিকাদার। ভাগ্যের সন্ধানে তিনি ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে আসেন। মোহাম্মদ বিন লাদেনের স্ত্রী ছিল বেশ কয়েকটি, সন্তান সংখ্যা ৫০-এরও বেশি। এদেরই একজন বিন লাদেন। মোহাম্মদ বিন লাদেন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলে সন্তানদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেননি। ষাটের দশকে তার

পরিবার সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে হিজাজে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মদিনায় বসতি স্থাপন করে। ওসামা বিন লাদেন তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বেশিরভাগই পেয়েছিলেন মদিনায় ও পরবর্তীকালে জেদ্দায়।

সত্তরের দশকে তেল সঙ্কটকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর বিপুল আর্থোপার্জন মোহাম্মদ বিন লাদেনের ভাগ্যের চাকা বদলে দেয়। হিজাজে উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকে এবং সেই সাথে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে লাদেনের নির্মাণ ব্যবসা। এই নির্মাণ ব্যবসার সূত্রেই সৌদি এলিটদের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ ঘটেছিল তার । অচিরেই আল-সৌদ পরিবারের সবচেয়ে উঁচু মহলের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। নির্মাণ কাজে তিনি শুধু উৎকর্ষ ও উন্নত রুচিই এনে দেননি, আভিজাত্যও সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সঙ্গে আল-সৌদ পরিবারকে গোপন কিছু সার্ভিসও দিতেন তিনি। তার মধ্যে একটি ছিল বিভিন্ন স্থানে অর্থ প্রেরণ। শীর্ষ মহলের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগে মোহাম্মদ বিন লাদেন তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারিত করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ কোম্পানিতে পরিণত করেন এবং তার নাম দেন বিন লাদেন কর্পোরেশন। আল-সৌদ পরিবার লাদেনের কোম্পানিকে মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদ নবরূপায়ন ও পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এতে কোম্পানির মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। সত্তরের দশকে বিন লাদেন কোম্পানি উপসাগরীয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি আরব দেশের রাস্তাঘাট, ভবন, মসজিদ, বিমানবন্দরসহ গোটা অবকাঠামো নির্মাণে জড়িত হয়ে পড়ে।

ওসামা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এ যেন কথাই ছিল। প্রথমে তিনি জেদ্দার হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে সেখানকার কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির ওপর অধ্যয়ন করেন। বাবা কথা দেন ওসামাকে তার কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। রাজ দরবারের সাথে বিন লাদেনের সরাসরি যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগের সুযোগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কনট্রাক্টগুলো বাগিয়ে আনতে পারবে তার কোম্পানি। ওসামার সত্তরের দশকটা আর দশটা বিত্তবান ও প্রভাবশালী সন্তানদের মতোই শুরু হয়েছিল। সৌদি আরবের কঠোর ইসলামী জীবনধারার বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে তিনি প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন কসমোপলিটন বৈরুতে। হাই স্কুল ও কলেজে পড়তেই তার বৈরুতে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল।

বিন লাদেনের ভাব পুরুষ

ভোগ বিলাসের উপকরণ বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি বিন লাদেনকে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের পর থেকে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। তখনও মাঝে মধ্যে প্রমোদ ভ্রমণে বৈরুত যেতেন বটে, তবে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাতে থাকেন। ইসলামী বইপত্র পড়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এবং আলেম ওলামাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ওসামার জীবনে এই পরিবর্তনটা আসলে ছিল সত্তরের দশকের আরব ও মধ্য প্রাচ্যের অস্থির সময়ের প্রতিফলন। এই অস্থির সময়ের একটি ফসল ছিল র‍্যাডিকেল ইসলামী চিন্তাধারা।

সে সময় র‍্যাডিকেল ভাবধারার অন্যতম পাঠ্যস্থান ছিল জেদ্দা নগরী। জেদ্দা বন্দর দিয়ে সৌদি আরবে পণ্য আনা নেয়ার পাশাপাশি মিসর ও অন্যান্য দেশ থেকে অ ইসলামী প্রচার পুস্তিকা ঢালাওভাবে চলে আসত। তা ছাড়া জেদ্দার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো র‍্যাডিকেল ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের কর্মকান্ডে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিন লাদেনসহ জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই র‍্যাডিকেল ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকান্ডের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী পর্যায়ে মিশর র‍্যাডিকেল আন্দোলনের জোয়ার, ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানের শাহের বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির বিজয় এবং খোদ সৌদি আরবে র‍্যাডিকেল শক্তির অভ্যুত্থান চেষ্টা (কাবার মসজিদুল হারাম দখলের ঘটনা) বিন লাদেনের মতো তরুণদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে। এরপর ঘটে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন। আগ্রাসনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রুশ দখলদারীর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা। আমেরিকা ও সৌদি আরব পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদদের অস্ত্র, রসদ, অর্থসহ যাবতীয় সাহায্য যোগাতে থাকে। সোভিয়েত হামলার পর মুজাহিদদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বার জন্য প্রথম যে ক'জন আরব আফগানিস্তানের গিয়েছিল ওসামা বিন লাদেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বলা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হামলা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিন লাদেন আফগানিস্তানের পথে প্রথমে পাকিস্তানে যান। সেখানে পৌঁছে আফগান মুজাহিদদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য দেখে হতবাক হয়ে যান।

অবশেষে নিজেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে আফগান যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েন। বিন লাদেন এ কাজের জন্য যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর মাধ্যমে উপসাগরীয় দেশগুলোর হাজার হাজার আরব যোদ্ধা আফগানিস্তানে পৌঁছে। আফগানিস্তানে অবস্থানের প্রথমদিকে শেখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। 'ইন্টারন্যাশনাল লিজিয়ন অব ইসলাম' নামে আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদের অতি দক্ষ ও জানবায একটি হার্টকোর বাহিনী প্রতিষ্ঠায় আযযাম ছিলেন আসল ব্যক্তি। আযযাম প্রসঙ্গে এখানে দুটো কথা না বললেই নয়। কারণ প্রকৃত অর্থে এই মানুষটি ছিলেন বিন লাদেনের ভাব পুরুষ।

আযযামের জন্ম ১৯৪১ সালে সামাবিয়ার জেনিন শহরের কাছে এক গ্রামে। ১৯৭৩ সালে তিনি মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের ওপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। মধ্যবর্তী সময়টিতে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কায়রোয় থাকাকালে তিনি ইসলামী জিহাদীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় বেশকিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে যাঁরা পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে বড় ধরনের প্রভাব রেখেছিলেন।

—-চলমান।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯০৪৯

সাহাবায়ে কেরামের ওয়ালা-বারার কিছু বিস্ময়কর চিত্র

আদনান মারুফ

Junior Member

০৯-২৬-২০১৮

ওয়ালা-বারা ইসলামের একটি মৌলিক আকীদা। সাহাবায়ে কেরাম ওয়ালা-বারার উপর এমনভাবে আমল করেছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, তাই এ ব্যাপারে তাদের কিছু বিস্ময়কর ঘটনা সংক্ষেপে তুলে করছি, যেন আমরা ওয়ালা-বারার উপর আমলের স্বরুপ জানতে পারি।

১ – ইমাম মুসলিম ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণণা করেন, "বদর যুদ্ধে সত্তরজন কাফের বন্দী হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে আবু বকর ও উমরের সাথে পরামর্শ করেন, আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, এরা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন, সুতরাং আমার মত হলো তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া, যেন এই অর্থের মাধ্যমে আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করতে পারি। এবং আশা করি আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিবেন। কিন্তু উমর বলেন, আমার মত আবু বকরের মতের থেকে ভিন্ন, আমার মত হলো, আমরা নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করবো, আলী তার ভাই আকীলকে হত্যা করবে, আমি আমার আত্মীয় অমুককে হত্যা করবো। কেননা এরাই কুফরের নেতৃবৃন্দ"। মুসনাদে আহমদের বর্ণণায় অতিরিক্ত এসেছে, "যেন আল্লাহ তায়ালা দেখে নেন, কাফেরদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন নম্রতা নেই"। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দেন, কাফেরদের শক্তি খর্ব করার জন্য হত্যা করাই সংগত ছিল। মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। (সহিহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৭৬৩ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ২০৮)

২ - আব্দুল্লাহ বিন শাওযাব রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিআল্লাহু আনহুর বাবা তাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করছিলো, কিন্তু আবু উবাইদাহ রাযিআল্লাহু আনহু তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন সে বারবার এমন করলো তখন আবু উবাইদাহ রাযিআল্লাহু আনহু তাকে

খতম করে দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধীদের ভালোবাসতে দেখবে না, যদিও বিরোধীবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতী-গোষ্ঠী হয়। সুরাতুল মুজাদালা, আয়াত: ২২) (আলমু'জামুল কাবীর তবরানী, হাদীস : ৩৬০, আলইসাবাহ, হাফেয ইবনে হাযার, ৫/২৮৬, হাফেয ইবনে হাযার এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩ – একব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমার পিতা আপনার নিন্দা করতো, তাই আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজে কোন কষ্ট পাননি। (সুনানে বাইহাকী, হাদীস : ১৭০৪২, আলইসাবাহ, লিলহাফেয ইবনে হাযার, ৯/৬২ বাইহাকী বলেন, এটি সহীহ সনদে বর্ণিত মুরসাল হাদীস)

৪ - বদরের যুদ্ধের সময় আবুবকর রাযিআল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুর রহমান কাফের ছিল এবং মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আবুবকর রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেন, "বদরের যুদ্ধের দিন আমি আপনাকে দেখেছিলাম, (এবং ইচ্ছে করলে আপনাকে টার্গেট করতে পারতাম কিন্তু হত্যা করার ইচ্ছা না থাকায়) পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলাম। জবাবে আবুবকর বলেন, কিন্তু আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম তাহলে তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩৭৯৫০)

৫ – বদরের যুদ্ধে মুসয়াব বিন উমায়েরের ভাই আবু আযীয বিন উমায়ের বন্দী হয়। এক আনসারী সাহাবী তাকে বন্দী করে বাঁধছিলেন, তখন মুসয়াব বিন উমায়ের তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। ভাইকে বন্দী করতে দেখে তিনি আনসারীকে বলেন, একে কষে বাঁধো, এর মা অনেক সম্পদশালী, তুমি বেশ ভালো মুক্তিপণ পাবে। এ কথা শুনে আবু আযীয বলল, ভাইয়ের জন্য এটাই আপনার অসিয়্যাত ? মুসয়াব রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, আমার ভাই তো এই আনসারী, তুমি নও !! (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাসীর, ৫/১৯১)

৬ - ইবনে হিশাম তার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, “উমর রাযিআল্লাহু আনহু সাইদ বিন আস রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেন, সম্ভবত তোমার ধারণা, আমি তোমার বাবাকে হত্যা করেছি, যদি আমি তাকে হত্যা করতাম তাহলে তোমার কাছে ওযরখাহি করতাম না। কিন্তু আমি তাকে হত্যা করিনি। বরং আমি আমার মামা আস বিন হিশাম বিন মুগিরাকে হত্যা করেছি। তোমার পিতাকে তো তার চাচাত ভাই আলী হত্যা করেছে।” আলইসাবাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, “উমর রাযিআল্লাহুর কথা শুনে সাইদ বিন আস বলেন, যদি আপনি তাকে হত্যা করতেন তাহলে আপনি হতেন হকের উপরে আর সে হত বাতিলের উপরে”। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৩০১, আলইসাবাহ ৪/৩৪২)

৭ - আবুয্ যিনাদ বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় আবু হুযাইফাহ রাযিআল্লাহু আনহু তার বাবা উতবাকে দ্বন্দযুদ্ধের প্রতি আহ্বান করেন, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাবার সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। ওয়াকেদী বলেন, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বদরের দিন মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের দ্বন্দযুদ্ধের প্রতি আহ্বান করে, তখন আবু বকর রাযিআল্লাহু তার মোকাবেলা করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই বলে নিবৃত্ত করেন, হে আবু বকর, (তোমার জীবন বাঁচিয়ে রেখে) আমাদেরকে তোমার দ্বারা উপকৃত হতে দাও। (সুনানে বাইহাকী, হাদিস : ১৬৭৭৪)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯৩৫

কিংবদন্তি মুজাহিদ শাইখ জালালুদ্দিন হক্কানি (রহঃ) এর জীবনি

[the unknown](#)

Junior Member

১০-০৯-২০১৮

নিম্নের লেখাটি ইমারাতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত শাইখ জালালুদ্দিন হক্কানি এর সংক্ষিপ্ত জীবনির রচিত আর্টিকেল এর অনুবাদালেখাটি ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হবে।

ইসলামি বিশ্বের বিশিষ্ট জিহাদি ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানী (তার রুহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

الحمد لله معز أوليائه المؤمنين وقامع أعدائه من الكافرين والمشركين والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ولي المتقين، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المجاهدين الصابرين، ومحبوب رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار كفاء ما قدم وكفاء ما علم و بين أما بعد. فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وقال تبارك وتعالى: فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم

নিম্নলিখিত বাক্যগুলো এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী, যে তার পুরো শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও জিহাদি জীবনে কখনও-ই পৃথিবীর কোন

অহংকারী, বর্বর ও স্বৈরাচারীর সামনে মাথা নত করেন নি এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধে অব্যাহতি দেন নি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত ও দূর করার দৃঢ় বিশ্বাস ও স্থিরসংকল্পের উপর ভিত্তি করে তিনি (রাহ) স্বকীয় ভূমিকা পালন করেছেন। একজন আফগান মুসলিম হিসাবে, ইসলামি এবং আফগান শৌর্য - বীর্য ও দৃঢ় সংকল্পের মিশ্রিত করে, আমাদের প্রিয় স্বদেশের উজ্জ্বল ইতিহাসে, তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জিহাদি প্রতিরোধ, নজিরবিহীন ত্যাগ ও অনন্তকাল স্থায়ী বীরোচিত কাজের উজ্জ্বল অধ্যায় অংকন করে গেছেন।

তাঁর জন্ম:

পাকতিয়া প্রদেশের 'ভাজা' জেলার 'সারানা' গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি খাওয়াজা মোহাম্মাদ খানের সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৪৪ ঈসায়ী (১৩৬৩ হিজরি) সালে আলহাজ্ব মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানী (তার রুহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) জন্মগ্রহণ করেন। দেশজুড়ে সুপরিচিত ও সম্মানিত 'যাদরান' জাতির 'মেযায়ে' গোত্রের 'সুলতান খাইল' বংশে তার জন্ম।

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা:

শৈশবের শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গভীর মহব্বত ও আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। ৪ বছর বয়স থেকে তিনি তার শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট পবিত্র কুরআন শিক্ষা শুরু করেন। কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন করে, তিনি আরও ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মাত্র ১০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন।

তিনি প্রখ্যাত আলিম 'মাওলানা মোহাম্মাদ ক্বাসিম'(আল্লাহ তার উপর রহম করুক) -এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শুরু করেন। যেহেতু পড়াশোনার প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এবং শিক্ষাগ্রহণের আল্লাহ প্রদত্ত স্বতন্ত্র ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সেহেতু তার প্রতি তার শিক্ষকের স্নেহ-মমতা প্রকট ছিল। সেই সময়ে, তিনি যুমরাট, পাকতিয়া প্রদেশের শাহী কট, উরগুন, পাকতিয়া প্রদেশের জিরোক, ওয়ারদাক প্রদেশ, গজনী প্রদেশের শিলগড় এবং খোস্ত প্রদেশের

ইসমাইল খাইল অঞ্চলের বিখ্যাত মাদ্রাসাগুলোর সুপ্রসিদ্ধ উলামার নিকট জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

তার অনুপম দক্ষতার দরুন, হযরত মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানি (রাহ.) খুব সহজে-ই তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় লক্ষ্য বেছে নিয়ে, তা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার্জন করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারতেন। একারণে তিনি 'পখতুন খাওয়া'-এর 'সাঈদ কারাম', 'সাল' এবং 'হাংগু' অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোতে তৎকালীন বিখ্যাত উলামার নিকট পড়াশোনা চালিয়ে যান। উচ্চতর ইসলামি শিক্ষার জন্য তিনি এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত মাদ্রাসা 'দারুলউলুম হক্কানিয়া'-তে ভর্তি হন, মাদ্রাসাটি 'দ্বিতীয় দেওবন্দ' নামেও পরিচিত।

সেখানে তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'হাদিসশাস্ত্রের' পূর্বের ও শেষবর্ষের মাস্টার ক্লাসে ভর্তি হন।

দ্বীনি ইলম অর্জনে তার বিশিষ্ট শিক্ষকদের নাম নিচে উল্লেখ করা হল:

মৌলানা মোহাম্মাদ কাসিম

মৌলভি বাদশাহ

মৌলভি সাঈদ হাসান

মৌলভী নাদার খান

মৌলভী খাজা

মৌলভী জার কালীম খান

মৌলভী আসীল খান

মৌলভী আবদুল ওয়াহাব

মৌলভী আখতার জান

মৌলভী মোহাম্মদ আইয়ুব

মৌলভী আব্দুল রহমান

মৌলভি সাঈদ সুলতান বাছা

মৌলভী আব্দুল হালিম

মৌলভী আব্দুল গণি

মুফতি মোহাম্মাদ ফরীদ

মৌলভী মোহাম্মদ আলী

মৌলভী নাসির খান

মাওলানা ডক্টর (পি.এইচ.ডি) শের আলী শাহ মাদানী

মাওলানা আবদুল হক ((রাহ.)) তাদের আত্মা যেন শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে)

একইভাবে, তার ছাত্রদের মধ্যেও এমন অনেক আলিম আছেন, যারা দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষায় অবদান রাখার কারনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিচে এক ঝাক থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল:

বেনু এলাকার শাইখ-উল-হাদীস মাওলানা ইলাতাফ-উর-রহমান

মাওলানা গুহার শাহ (দারুল উল উলুম চরসাদ্দার শাইখ-উল-হাদীস এবং পাকিস্তান সংসদের সাবেক সদস্য)

শাইখ-উল-হাদীস মৌলানা গোলাম মোহাম্মদ সাদিক

অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মাদ শফীয়া

শাইখ-উল-হাদীস ও মুফতি সুলতান উমর (খস্ত প্রদেশের মাদ্রাসা মানবা-উল-উলুমের একজন বিখ্যাত শিক্ষক)

শিক্ষক ও অগ্রদূত হিসাবে:

আলহাজ্জ মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানি 'আকরা খাতকে' অবস্থিত 'দার উল উলুম হক্কানিয়া' থেকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেন। যদিও 'দার উল উলুম হক্কানিয়ার' মতো বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক উত্তীর্ণ ছাত্রের পক্ষে আবার একই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু হাক্কানী সাহেবের দক্ষতা, ধার্মিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কিছু অন্যান্য

বৈশিষ্ট্য ছিল যা 'দার উল উলুম হাক্কানিয়ার' মর্যাদাপূর্ণ অনুষদকে, বিশেষতঃ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 'মৌলানা আবদুল হক' (রাহ.-কে, একই মাদ্রাসা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করা মাত্র তাকে (হক্কানী সাহেব) শিক্ষক অনুষদে একজন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আগ্রহী করে তুলেছিল । শিক্ষক হিসাবে প্রথম বছর তিনি কিছু অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সাহিত্যের কিছু মৌলিক, কিন্তু কঠিন বিষয় শিখিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরে, প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে উচ্চ শ্রেণীর কিছু বিষয় শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

প্রথম হজ্জ সফর:

যদিও 'দারুলউলুম হক্কানিয়া'-র প্রশাসন তাকে সেখানে আরও কিছুদিন শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তার স্বদেশের রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক পরিস্থিতির জয়ের জন্য তিনি সেখানে তার দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না এবং তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। বস্তুত তিনি নিজ দেশের নির্যাতিত, বঞ্চিত ধার্মিক জনগণের জন্য তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও শক্তি ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি ১৩৯৩ হিজরি সনে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে) হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি পায়ে হেটে সফর করেন ও হাজ্জ সম্পন্ন করেন। সেখানে আফগান উলামার পাশাপাশি তিনি মর্যাদাবান ও সুপ্রসিদ্ধ উলামা এবং মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে তিনি মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট নিয়ে, বিশেষ করে আফগানের উত্তরাংশে ধর্ম বিদ্বেষী প্রচারণা নিয়ে সুদীর্ঘ ও ব্যাপক আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক সংগ্রাম:

যখন হাক্কানী সাহেব হজ্জ থেকে ফিরে গেলেন, তখন রাজতন্ত্রের শেষ যুগ ছিল এবং ইতিমধ্যে এর পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে, কমিউনিস্টের ঘৃণ্য মতাদর্শ এবং মার্কসবাদ আফগানের সীমানা অতিক্রম করে ফেলে এবং দ্রুত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য হক্কানি সাহেব

পাকতিয়া প্রদেশে সমস্ত ছোট ও বড় গোত্রের মধ্যে বৃহৎ জনসভার আয়োজন করেন এবং তিনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়া নাস্তিকতার বিপদ সম্পর্কে এবং তাদের অনিবার্য বিকৃত রুচি সম্পর্কে সচেতন করতে থাকেন। এই কাজে, তিনি সেই অঞ্চলের বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে পুরোপুরি সমর্থন পান। লোকদের যারা নতুন ধর্মবিরোধী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাদের অধিকাংশ নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়।

দাউদ খানের আকস্মিক অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী পদ্ধতিসমূহ:

১৯৭৩ সালের ১৭-ই জুলাই, দাউদ খান একটি আংশিকভাবে ন্যায়সঙ্গত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেন এবং শাসকে পরিণত হন। তার সমর্থকদের যারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল, তারা সরকারি অফিসের পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরের কিছু উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় দাউদের বিরুদ্ধে দুটি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি হল, আফগানিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতা (রহস্যবাদ/সূফীবাদ)-এর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 'কালা জাওয়াদ'-এর উলামা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় উলামা-র (ধর্মীয় পণ্ডিতদের) আন্দোলন। দ্বিতীয় আন্দোলনটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তরুণ ছাত্রদের, যাকে 'ইসলামিক নাহাজা (অর্থাত পুনর্মিলন বা পুনরুজ্জীবন)' বলা হয়।

তাই আফগানের সর্বাধিক বিশিষ্ট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব জিয়া-উল মাশাইখের (রাহ) অনুমতি ও নির্দেশনায়, আল-হজ মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি দাউদ খান ও তার কমিউনিস্ট সমর্থকদের ধর্ম-বিরোধী নীতির বিরোধিতা শুরু করেন। এসকল উলামার মধ্যে আছেন:

মৌলভী নাসরুল্লাহ মনসুর

মৌলভী ফাতেহুল্লাহ

মোল্লা নিজামউদ্দীন

মৌলভী আহমদ গুল

মৌলভী আজিজ খান

মৌলভী মোহাম্মাদ হাসান

উপরের উল্লিখিত পণ্ডিত ও তাদের অনুসারীরা বৃহত্তর পাকতিয়া, কাবুল এবং অন্যান্য একাধিক প্রদেশে বাস্তব সংগ্রাম শুরু করে। সেই সময় মাওলানা জালুদ্দীন হক্কানি,মৌলভী আহমদ গুল কর্তৃক নির্মিত এবং পাকতিয়া প্রদেশের 'নাককা' জেলায় অবস্থিত 'মাদ্রাসা রহমানিয়া'তে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার অন্য সহকর্মী মৌলভী ফাতেহুল্লাহ হাক্কানি 'তুরি খাইল' এলাকার 'মাদ্রাসা হাবিবিয়ায়' শিক্ষাদান করতেন। হাক্কানী সাহেব 'মাদ্রাসা হাবিবিয়িয়া'কে তার কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক ও নাস্তিকদের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। বিভিন্ন মুজাহিদীন তখন জিহাদী আন্দোলনের জন্য সাধারণত পরামর্শ ও অন্যান্য পরিকল্পনা করার জন্য এই স্থানে আসতেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

গুলবউদ্দিন হিকমতিয়ার

মোল্লা নিজামউদ্দিন হক্কানি

মৌলভী নাসরুল্লাহ মনসুর

মৌলভী আহমাদ গুল

মাতিউল্লাহ খান

মোহাম্মাদ ইবরাহীম হক্কানি

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১২৭

ড.আফিয়া সিদ্দিকি

Sabet

Member

০৪-০৫-২০১৮

ড.আফিয়া সিদ্দিকী মরে গিয়ে প্রমান করেছিলেন-মালালা জীবিত থেকেও মৃত। - দিল মোহাম্মদ মামুন এর বাংলা ব্লগ । bangla blog | সামহোয়্যার ইন ব্লগ পোস্টটি যিনি লিখেছেন

৬-৭ minutes

ড. আফিয়া সিদ্দিকী মরে গিয়ে প্রমান করলেন-মালালা জীবিত থেকেও মৃত।

মরে গিয়ে বরং বেঁচেই গেলেন আফিয়া। বিশ্বের একমাত্র নিউরো সাইন্টিস্ট ড.আফিয়া সিদ্দিকী অবশেষে মুক্তি পেলেন নারকীয় যন্ত্রনা থেকে। নিস্তার পেলেন আমেরিকান ধর্ষকদের খেলা থেকে, বিশ্ব দর্শকদের হেলা থেকে। বেঁচে গেলো পিচ্চি মেয়ে মালালাও। আশ্চর্য এক ম্যাসেজ মিলছে এই দু'জন থেকে। দু'জনেই পাকিস্তানি। মালালা স্কুল পড়ুয়া এক কিশোরী। আফিয়া পিএইচডি হোল্ডার। একজনকে ওরা খুবলে খায়, অন্যজনকে নিয়ে মেতে ওঠে পরিকল্পিত খেলায়! ড. আফিয়াকে আল-কায়েদার সাথে জড়িত সাজিয়ে ইউএস আদালত তাকে সাজা দেয়। সাথে দেয় গণ ধর্ষণের অলিখিত লাইসেন্স। আর মালালাকে কোলে তুলে গেয়ে উঠে মানবতার গান! বিশ্ব বিবেক গা ভাষায় স্রোতের অনুকূলে! মানবতার ধ্বজাধারীরা বসে থাকে মুখে কুলুপ এটে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার এক চোখা দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে যায় এই দিক।

২০০৩ সালে প্রথমে কিডন্যাপ করা হয় ড. আফিয়াকে। এই কিডন্যাপিংয়ে সহায়তা করে খোদ পাকিস্তান সরকার। গুম করে রাখা হয় ২০০৮ পর্যন্ত। নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকান টর্চার সেলে। চলতে থাকে গণ ধর্ষণ, দিনের পর দিন। তাকে উলঙ্গ করে কুরআন শরীফের পাতা ছিড়ে মেঝেতে বিছিয়ে রেখে বলা হত, যাও, কুরআনের উপর দিয়ে গিয়ে কাপড় নিয়ে এসো। ড. আফিয়া সেটি করতে

পারতেন না কারণ, তিনি মুসলমান। কারণ তিনি কুরআন ভালবাসতেন। ৩০ পারা কুরআন যে তার বুকেও ছিল। তিনি যে একজন হাফেজাও ছিলেন। তখন তার উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যেত আরো। ২০০৮ সালে তাকে নিয়ে সাজানো হয় মূল নাটক। এক আমেরিকান সেনা হত্যা চেষ্টার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার দেখানো হল। শুরু হয় বিচারিক প্রহসন। আমেরিকান আদালত তাকে ৮৬ বছরের সাজা ঘোষণা করে! একজন নারী, একজন মুসলিম সাইন্টিস্ট কুরআনে হাফেজা নারীকে নিয়ে বিশ্ব মোড়লরা মেতে উঠলো নোংরা খেলায়, দেড়'শ কোটি মুসলমানের এই দুনিয়ায়, ছয়'শ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে কেউ কিছু বললো না! কেউ না! আশ্চর্য এক পৃথিবীতে আমাদের আবাস!

ড.আফিয়ার বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচারিক রায় ঘোষণার সময় তাকে কিছু বলতে বলা হলে বিচারকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আপনি তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে রেফ করার, উলঙ্গ করে সার্চ করার! আপনার কাছে কিছুই বলবার নেই আমার। আমি আমার আল্লাহর কাছে যেয়েই যা বলার বলবো। আমি তো সেদিনই মরে গেছি যেদিন আমাকে প্রথম ধর্ষণ করা হয়েছিলো। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে আমার দেশে যেতে দিন।" ড.আফিয়ার সাথে নোংরা খেলার এই নায়কদেরই যখন দেখি মালালাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে, হা হুতাশ করতে, মানবতার পক্ষে বড় বড় বুলি আওড়াতে, তখন সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে মালালা তাদের নিজেদেরই প্রোডাকশন কিনা! অথবা উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্যে তারা নিজেরাই তালেবান সেজে মেয়েটিকে গুলি করেছে কি না!

বিশ্বের একমাত্র স্নায়ূ বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকির তাঁর মূল অপরাধ ছিলো তিনি এতো উচ্চ শিক্ষিত হয়ও কুরআনের প্রতি ঝুকে ছিলেন কেনো? কুরআন থেকে কেনো রেফারেন্স টানতেন? ১৯৯৩ সালের একটি ভিডিও ক্লিপের সৌজন্যে আমার সুযোগ হয় একুশ শতকের এই হযরত সুমাইয়ার বক্তব্য শোনার। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমার বোনের কথাগুলো। কুরআনের একটি একটি আয়াত তেলাওয়াত করে বৈজ্ঞানিক সূত্রে কথা বলছিলেন তিনি। তিনি বলছিলেন, ইসলাম হলো নারীর সুরক্ষক। ড.আফিয়া সিদ্দিকার বক্তব্যের অংশ ইউটউব দেখতে পারেন। মানুষটিকে ওরা মেরে ফেললো তিলে তিলে। অকথ্য নির্যাতন করে। বিশ্ব মিডিয়া চেপে গেলো খবরটি, সেই প্রথম থেকেই। ইন্টারনেটে প্রকাশিত এক চিঠিতে মুসলিম জাতিকে তিনি ঘুমন্ত মৃত জাতি বলে সম্ভোধন করে কিছু

আক্ষেপের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমি আর তোমাদের সাহায্যের আশা করি না। আমি তোমাদের বোন না। তোমরা কেউও মুহাম্মদ বিন কাসেম না। আমি আমার আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই, আর কারো কাছেই না আফিয়া মিথ্যে বলেননি মোটেও।

সেকুলার লিবারেল ছোট্ট একটি মেয়ে মালালাকে এই সময়ের সেরা বুদ্ধিজীবি বানিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হলো আর ওদিকে আফিয়ার উপর চলতে থাকলো পৈশাচিক নির্যাতন। কেউ কিছু বললো না। কেউ বললো না ছোট্ট মেয়ে মালালাকে যে বা যারাই গুলি করেছে, অন্যায় করেছে, চরম অমানবিক কাজ করেছে। তালেবানরা এটা করে থাকলে তাদের অনুকম্পা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। দোষীদের খোঁজে বের করে ফাসিতে ঝুলানো উচিত। কিন্তু কথা তো এখানেই শেষ হতে পারে না। এক মালালাকে নিয়ে এতো দৌড় ঝাপ কিন্তু বিশ্বে যে আরো মালালা আছে ইরাকে, আফগানে, ফিলিস্তিনে, সিরিয়ায়, পশ্চিমা ন্যাটো ঝুটের অবিরত ড্রোন হামলায় যে মালালারা মারা যাচ্ছে, তাদের কী হবে?

এদের বেলায় মানবতা নিরব কেনো? নাকি বিশ্ব সভ্যতার ঠিকাদার কর্তৃক অসভ্যতা চললে সেটাকে অসভ্যতা বলতে হয় না! এই শিশুরা তো কোনো পাপ করেনি। এই শিশুরা তো অস্ত্র ধরেনি। কেনো তবে হত্যা করা হচ্ছে এদের? মালালা আমার বোন। সে সুস্থ হোক। কিন্তু ইরাকের এই শিশুরা কি মালালা থেকে কম? তাহলে কেনো তাদের বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না? ডবল স্ট্যান্ডার্ড আর কতদিন চলবে? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মহাত্মা গান্ধীর ভারতে গেলো চল্লিশ বছরে সাত হাজারের বেশি কাশ্মিরী শিশুকে জীবন দিতে হয়েছে। এই শিশুরা, আফগান, ইরাক আর কাশ্মিরের এই শিশুরাতো আর সন্ত্রাসবাদী ছিলো না। এরা কোথাও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়নি। এরা জীবনে কাউকে একটা গুলিও করেনি। তাহলে এদের মেরে ফেলা হলা কেনো? এই শিশুদের অপরাধ কী ছিলো? বিশ্ব মানবতা এদের বেলায় নিরব কেনো? মানবতার নামে কেনো এই উপহাস?

মারা গেলেন ড. আফিয়া সিদ্দিকি। নয় নয়টি বছর লাগাতার ধর্ষণ আর নির্যাতনের সাথে সাথে তার শরীরে ক্যান্সারের বীজও পুতে দিয়েছিলো সভ্যতার মুখোশপরা নরপশুরা। শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রনার দু:সহ নারকীয় একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হলো। বুকে কুরআন নিয়ে মাথা উচু করেই বিদায় নিলেন আফিয়া। চলে গেলো

বোনটি আমার। আমরা তাকে বাঁচাতে পারলাম না। তারচে' দু:খজনক হলো বাঁচানোর চেষ্টাটা পর্যন্ত করলাম না। কেউ বললাম না ড. আফিয়া যদি অপরাধ কিছু করেই থাকেন, নিরপেক্ষ আদালতে তাঁর বিচার হতে পারে (যদিও জানি না সেটি কোন গ্রহে আছে) কিন্তু একটি মেয়েকে, বিশ্বের একমাত্র নিউরো সাইন্টিস কোরআনে হাফিজ একটি মেয়েকে এভাবে বছরের পর বছর আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করা আর নির্যাতন করা তো কোনো সভ্য পৃথিবীতে চলতে পারে না। হায়রে সভ্যতা! হায়রে মানবতা! আজকাল মানুষে আর পশুতে পার্থক্যটা এতো কমে এসেছে যে, ফারাক করতে কষ্ট হয়।

মালালা ইউসুফজাইকে ওরা কোলে তুলে নিয়েছে এই বলে, মালালা ছিলো নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সোচ্চার কণ্ঠ। আফিয়াকে ওরা মেরে ফেলেছে তিলে তিলে কারণ, আফিয়া ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, নিউরো সাইন্টিস্ট। তবু ওরা কী চায়, কীভাবে চায়, বিশ্ব বিবেক তবুও বুঝে না নাকি বুঝেও বুঝে না, আমি সেটাই বুঝি না! আফিয়া তো চলে গেলেন! বিশ্ব বিবেকের গালে চপেটাঘাত করে। একজন আফিয়া এভাবে নিষ্পেষিত হয়ে বিদায় নিলো আমাদের চোখের সামনে। কেউ কিছু বললো না! কেউ কিছু করলো না! বুঝতে পারছি না ধিক্কার আমি কাকে দেবো? লাম্পট্যবাদে জড়িত আমেরিকানদের? বৈশ্বিক বোবা বৃহন্নলাদের? মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে? নাকি এই সময়ের অংশ হিসেবে নিজেকেই?

পুরানো লিখাটি এই ব্লগে পোষ্ট করলাম

সর্বশেষ এডিট : ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ দুপুর ১২:২৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৪৭৮

*****